সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া

হযরত মাওলানা মুফ্‌তি মুহাম্মদ সফী (রাহঃ)

প্রকাশক ঃ

মাওঃ মাছউদুল হাসান

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

নাদিয়া ভবন

৫৯, চক বাজার, ঢাকা।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বকথা

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মাওজুদাত রূহে দুম্বআলম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত বা জীবন চরিত পড়া ও পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখেনা। এ কারণেই যখন থেকে উম্মতের মধ্যে গ্রন্থ সংকলণ ও সম্পাদনার প্রচলন হয়েছে, তখন থেকেই প্রত্যেক যুগের আলেমগণ নিজ নিজ ভাষায় "সীরাতুন নবীঃ বা নবীর জীবন চরিত লিখে আসছেন। এই অবিচ্ছিন্ন ধারায় কতশত গ্রন্থ যে রচিত হয়েছে এবং হবে তা আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

نہ بران کل عارض غزل سرایم وبن

کہ عندلیب توازمی یرطرف هزاران اند ١٢

অর্থাৎ, হাযারো বুলবুলি যার প্রশংসা করে যেখানে ফিরছে সেখানে আমি নগণ্য আর কি তার তা'রীফ করব।"

মুসলমান লেখক ছাড়া ও হাযার হাযার অমুসলিম লেখক মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিরাত রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের কথা তো উল্লেখযোগ্য। বিশ/ত্রিশ খানা গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদেরও জানা আছে। কিন্তু তারা সাধারণভাবে ঘটনা বর্ণনায় অতি বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। এ জন্য মুসলমানদের এগুলো পাঠ করা হতে বিরত থাকতে হবে।

মোটকথা, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন মানবের জীবন চরিত খাতিমুল আম্বিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন চরিতের মত এত গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ হয়নি।

এক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনীকারগণের ক্রমধারা অত্যন্ত প্রশ্বস্ত যা বর্ণনাতীত। কিন্তু এর মধ্যে স্থান লাভ করা গর্বের বিষয়। –(সীরাতুন নবী দ্রঃ)

উর্দু ভাষায় নতুন পুরনো মিলে অনেক জীবনী গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি অনেক দিন ধরে এমন একটি সংক্ষিপ্ত সীরাতের কিতাব তালাশ করছিল, যা প্রত্যেক পেশাজীবী মুসলমান নারী পুরুষ দুই তিন বৈঠকে পাঠ সমাপ্ত করে

নিজের ঈমানকে তাজা করতে পারে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং যা ইসলামী সংগঠনও মাদ্রাসাসমূহের প্রাথমিক সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। যার মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনের মোটামুটি নক্‌শা সতর্কতার সাথে আসল ছাচে পরিপূর্ণ ভাবে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু উর্দু ভাষায় এই ধরনের কোন পুস্তক আমার নযরে পড়েনি।

এরই মধ্যে সিমলার কোন কোন বন্ধু তাদের ইসলামী সংগঠনের জন্য এমন একটি পুস্তকের প্রয়োজন মনে করে অধমের কাছে আবেদন করল। নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা তদুপরি অধ্যাপনা ও অধ্যয়ণের ব্যস্ততা থাকার পরও এ ধারনায় কলম ধরলাম যে, যে সময় সাইয়্যেদুল কাউনাইন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনীকারদের নাম আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে সে সময় এই অধমের নামটিও এক পাশে থাকবে।

بلبل يمين كه قافيه كل شود يس ست-

"অর্থাৎ, বুলবুলির ফুলের ঘ্রাণ নেয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই।" একজন্যই আল্লাহর নামে এই পুস্তকের রচনার কাজ আরম্ভ করেছি। নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির সারাংশ তাতে পেশ করা হয়েছে।

১. পুস্তকটি যেন দীর্ঘায়িত না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ জন্য আরবের ভৌগলিক অবস্থান প্রাক ইসলামী যুগের আরব ও অনারবের সার্বিক অবস্থা যাকে সীরাতের অংশ বলে মনে করা হয়। এবং উপকারী ও বটে এ গুলোকে পরিহার করে শুধু ঐ অবস্থা সমূহকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে, যা নিতান্তই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্বার সাথে সম্পৃক্ত। এই সংক্ষিপ্ততার কারণেই এর একটি নাম হল –

"اوجزالسير ليخير البشر

(সৃষ্টির সেরা মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী)

২। সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, সকল দিকের পরিপূর্ণতা যেন বহাল থাকে। আলহামদুলিল্লাহ সকল জরুরি বিষয়গুলো তাতে এসে গেছে।

৩। জিহাদ, বহু বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের সকল ভ্রান্ত প্রশ্নের সমূচিত জবাব দেওয়া হয়েছে।

৪। পুস্তিকাটির উৎসমূল হচ্ছে নির্ভর যোগ্য ও প্রামান্য গ্রন্থসমূহ। সেগুলোর বরাত যথাস্থানে পৃষ্ঠা নং সহ উল্লেখ করা হয়েছে। তম্মধ্যে কতকগুলোর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১। মেশকাত শরীফ ২। ব্যাখ্যা গ্রন্থ সকল সিহাহ্ সিত্তা ৩। কন্‌যুল উম্মাল ৪। ইমাম সুয়ূতীর খাসায়েসে কুবরা। ৫। মাওয়াহিবেলাদুন্নিয়া ৬। সীরাতের মোগলতাঈ ৭। সীরাতে ইবনে হিশাম। ৮। খাফাজীর ব্যাখ্যা গন্থসহ কাযী আয়ায রচিত "শিডেফা" গ্রন্থ। ৯। সীরাতে হালবিয়া ১০। যাদুল মা'আদ। ১১। তারীখে ইবনে আসাকির। ১২। শাহ্ ওলী উল্লাহ দেহলবী কৃত সিরুরুল মাহযুন ১৩। শায়খ আহমদ ইবনে কায়েস রচিত "আওজামুসসীয়ার ১৪। হাকীমূল উম্মত রচিত "নশরত্তীব" ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র অশেষ শুকুর এই যে, তিনি এই নগণ্যের প্রচেষ্টাকে কবুল করেছেন এবং সবার পূর্বে আমার পীর ও মুশির্দ হযরত হাকিমূল উম্মত থানভী (রহঃ) একে পছন্দ করে খানকায়ে এমদাদিয়ার সিলেবাস পাঠ্যসূচি এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আর তার বিরচিত পুস্তক "তাতিম্মাতে ওসিয়ত" এ এর ঘোষণা প্রদান করতঃ অন্যকে তৎপ্রতি উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং শুধুমাত্র তিন মাসের মধ্যে পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান ও বাংলার শতাধিক মাদ্রাসা এবং ইসলামী সংগঠণের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি সাহারানপুরস্থ মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব জানিয়েছেন যে, তার মজলিসে শুরাও পুস্তিকা খানাকে এবতেদায়ী জামাতের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন।

والحمدلله اوله واخره

বান্দা

মুহাম্মদ শফী

২৮ যিলহাজ্জ

১৩৩৮ হিজরী।

অনুবাদকের আরয

গোটা তেইশ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ মহান আল কুরআন। আর এ ত্রিশ পারার পবিত্র মহান আল কুরআনের বাস্তবতা হচ্ছে মহান মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আয়শা (রাঃ) কে জনৈক সাহাবী বলেন, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন চরিত আমাদেরকে শুনান। তিনি জবাবে বলেন, "তুমি কি কুরআন পড়নি? সাহাবী বলেন, হ্যাঁ কুরআন তো নিশ্চয়ই পড়েছি। "উম্মুল মুমেনীন বলেন, "পবিত্র কুরআনই তো মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর জীবন চরিত।" তাহলে এক কথায় বলা যায়, তামাম পৃথিবীর সমস্ত পানি আর বৃক্ষ দ্বারা কালি আর কলম বানিয়ে কুরআনের গুনাবলী যেমন শেষ করা সম্ভব হবেনা ঠিক তেমনভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন চরিত, গুণ-জ্ঞানও লিখে শেষ করা যাবেনা। যেহেতু কুরআনই হচ্ছে তাঁর জীবন চরিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর জীবন চরিত এ পর্যন্ত পৃথিবীতে একাধিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে উর্দু ভাষায় প্রাতঃস্বরণীয় আলেম আল্লামা মুফতি শফী (রঃ) এর "সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়া" এক অনন্য কিতাব। কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হলেও তার পৃথক একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ভূমিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। এর বাংলা অনুবাদ ইতিপূর্বে আরও অনেক রচনা হয়ে থাকলেও আমি নগণ্য এর অনুবাদ এ জন্যই করতে প্রয়াস পেয়েছি যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সুঘ্রান রয়েছে। কবি বলেন, هرکل رارنکی بوبی دیکراست অর্থাৎ একেক ফুলের একেক গন্ধ। যত মানুষ বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবন চরিত লিখবে ও মন্থন করবে ততই স্বাদ আরও বৃদ্ধি পাবে। আরবি কবি বলেন– يزيدك وجهه حسنا اذاما زادته نظرا অর্থাৎ, "তুমি যতই গভীর ও সুক্ষ্ম নযরে তার মুখ মণ্ডলের দিকে তাকাতে থাকবে ততই তার চেহারার সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য তোমার সামনে বাড়তে থাকবে।

আমি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে এতবড় কাজে হাত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। নতুবা আমার মত অযোগ্য ও নগণ্য লোকের এহেন বিরাট কাজে হাত দেয়া দুঃসাহস বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে, ভাষান্তরের বেলায় মূল বিষয়বস্তুকে পাঠকের সামনে অতি সহজভাবে তুলে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বিষয়ের মৌলিকত্ব রক্ষা করাই আমার আসল মকসুদ ছিল। পাঠকবৃন্দ আশাকরি এ কথাটি যথাযথ ভাবে স্মরণ রাখবেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাঁদের প্রতি যাঁরা উক্ত গ্রন্থখানী অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সর্ব প্রথম আমি পরামর্শ করি আমার শ্রদ্ধেয় ভাই মাওঃ মাসউদূল হাসান সাহেবের সাথে। তিনি আমাকে ইহার অনুবাদের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রদান করেন। তাঁর অনুপ্রেরণার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে বলতে চাই, গ্রন্থটি পাঠে যে সব অনিচ্ছাজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি পাঠকের কাছে ধরা পড়বে সেগুলো অনুগ্রহ করে আমাদের অবগত করলে শুকরীয়া জ্ঞাপন করব। সর্বশেষে আল্লাহ পাকের নিকট এই আরয করছি যে, আয় আল্লাহ! আপনি আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রায়সখানি কবুল করে আমাদের নাজাতের উছিলা করুন। আমীন

বিনীত

মুহাম্মদ আন্‌ওয়ারুল বারী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

সীরাতে খাতামুল্ আম্বিয়া

মহানবী (সাঃ) এর বংশ পরিচয়

মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র বংশ সারা দুনিয়ার সব বংশাবলী থেকে অতি পবিত্র ও সম্ভ্রান্ত। (১) ইহা এমনি একটি বাস্তব সত্য কথা যে, তার চরম দুশমন ও মক্কার কাফেরকুলও তা অমান্য করতে পারেনি। রোমের বাদশাহরে সামনে হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কাফের থাকাবস্থায় তা স্বীকার করেছিলেন। অথচ তিনি তখন চেয়েছিলেন যে, যদি কোন সুযোগ-সুবিধা হয়ে যায়, তাহলে মহানবী (সাঃ) এর উপর দোষারোপ করবেন।

সম্মানিত পিতার পক্ষ থেকে মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র বংশধারা

মুহাম্মদ (সাঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনেহাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুর্‌রা ইবনে কা'ব ইবনে লয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফেহ্‌র ইবনে মালেক ইবনে নাযার ইবনে কেনাননাহ্ ইবনে খুযষাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াছ ইবনে মুযার ইবনে নিযার ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান।

এই পর্যন্ত বংশ ধারা উম্‌মতের ঐক্যমতে প্রমাণিত। এবং এখান থেকে আদম আলাইহিসসালাম পর্যন্ত বংশ তালিকায় মতানৈক্য থাকায় তার বিবরণ পরিত্যাগ করা হল।

সম্মানিতা মাতার পক্ষ থেকে বংশ তালিকা নিম্নরূপ

মুহাম্মদ (সাঃ) ইবনে আমিনা বিন্‌তে ওয়াহাব ইবনে আব্‌দেমানাফ ইবনে যুহ্‌রা ইবনে কিলাব। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কিলাব ইবনে মুর্‌রা পর্যন্ত মহানবী (সাঃ)- এর পিতা ধারা একসাথে মিলিত হয়ে যায়।

পার্শ্ব টিকা ঃ (১) দালায়েলে আবু নাঈম মারেফুল হাদীস দ্বারা বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলেছেন, আমি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পশ্চিম প্রান্তে ভ্রমন করেছি কিন্তু বনি হাশিম অপেক্ষা সর্বোত্তম আর কোন বংশাবলী দেখি নাই।" –(মাওয়াহিব)

মহানবী (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে প্রকাশিত বরকতসমুহ

যেভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে সুবেহ সাদিকের বিশ্বব্যাপি আলো ও প্রান্তের লালিমা পৃথিবীকে সূর্যোদয়ের সুসংবাদ দেয়, ঠিক্ সে ভাবে নবুওয়তের সূর্য মহানবী (সাঃ) এর উদয় হবার সময় যখন ঘনিয়ে এল, তখন পৃথিবীর চার পার্শ্বে এমন অনেক ঘটনা সমূহ প্রকাশ পেতে লাগল, যা মহানবী (সাঃ) এর আগমন বার্তা বহন করছিল।

হাদীস তত্ববীদ ও ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় এ গুলোকে ইর্হাসাত বা ভিত্তিসমুহ বলাহয়। (সেহেতু এধরণের আলৌকিক বিষয়গুলি নবুওয়তের পূর্বাভাস ও লক্ষণ বিশেষ, তাই এ সকল বিষয়গুলিকে ইরহাসাত বা ভিত্তি সমূহ বলা হয়)।

মহানবী (সাঃ) এর সম্মানিতা মাতা বিবি আমিনা থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ) যখন তাঁর মাতার গর্ভে স্থিতিশীল হলেন, স্বপ্নযোগে তাঁকে সুসংবাদ দেয়া হল যে, "যে সন্তানটি তোমার গর্ভে রয়েছে তিনি উম্মতের দলপতি। তিনি যখন ভূমিষ্ট হবেন তখন তুমি এই দোয়া করো ঃ আমি তাঁকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে অর্পন করলাম এবং তাঁর নাম রেখ মুহাম্মদ (সাঃ)"।

—(সীরাতে ইবনে হিশাম দ্রঃ)

বিবি আমিনা আরও বর্ণনা করেন, আমি কোন মহিলাকে মহানবী (সাঃ) থেকে বেশী হাল্কা পাতলা ও সহজ গর্ভ ধারণ করতে দেখিনি। অর্থাৎ, গর্ভাবস্থায় সাধারণ মহিলাদের যে বমি বমি ভাব বা অলসতা ইত্যাদি হয়ে থাকে এসব কিছুই আমার হয়নি।" এছাড়া আরও বহু ঘটনা হয়েছে, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকায় তা বর্ণনা করার সুযোগ নেই।

হুযুর (সাঃ) এর মোবারক আবির্ভাব

অধিকাংশ আলেমগণ এই কথার উপর একমত যে, মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাব রবিউল আওয়াল মাসের সেই বছর হয়েছিল যে বছর 'আসহাবে ফীল' (হস্তী বাহিনী) কা'বা ঘর আক্রমণ করেছিল। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদেরকে আবাবীল নামক নগণ্য পক্ষিকুলের দ্বারা পরাজিত করেছিল। পবিত্র কোরআনে 'সূরা ফীলে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আসহাবে ফীলের ঘটনাটিও (১) মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র বেলাদত সম্পর্কিত বরকতসমূহের সূচনা স্বরূপ। মহানবী (সাঃ) সেই ঘরে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের হস্তগত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের (২) মতে আসহাবে ফীলের ঘটনাটি ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২০ শে এপ্রিল সংঘটিত হয়েছিল। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী (সাঃ) এর জন্ম হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের ৫৭১ বৎসর পরে হয়েছিল।

পার্শ্ব টিকা ঃ- ১. সীরাতে মোগলতাঈ পৃঃ ৫ ।

(২) দুরুসুত্ তারীখুল ইসলামী লিল হাইয়াত পৃঃ ১৪ ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহ তার বিরাট হস্তী বাহিনী নিয়ে কাবা শরীফ ধ্বংশ করতে এসেছিল। এদেরকে আসহাবে ফীল বা হস্তী বাহিনী বলা হয়।

হাদীস শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা ইবনে আসকির (রঃ) পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখেছেন ঃ হযরত আদম (আঃ) ও নুহ্ (আঃ) এর মধ্যে ১ হাজার দুই শত বৎসরের ব্যবধান ছিল এবং নুহ্ (আঃ) থেকে ইব্রাহিম (আঃ) পর্যন্ত ১১ শত ৪২ বৎসর ইব্রাহিম (আঃ) থেকে মুসা (আঃ) পর্যন্ত ৫৬৫ হযরত মুসা (আঃ) থেকে হযরত দাউদ (আঃ) পর্যন্ত ৫৬৯ বৎসর,হযরত দাউদ (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৬ বৎসর এবং হযরত ঈসা (আঃ) থেকে আখেরী নবী মুহাম্মদ এর মধ্যে ৬০০ বৎসরের ব্যবধান ছিল। এই হিসাবে হযরত আদম (আঃ) থেকে আমাদের মহানবী (সাঃ) পর্যন্ত ৫ হাজার ৩২ বৎসর। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত আদম (আঃ) এর বয়স ছিল ৪০ কম ১ হাজার অর্থাৎ ৯শত ৬০ বৎসর। এজন্য আদম (আঃ) দুনিয়াতে অবতরণের অন্তত ৬ হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তম সহস্রাব্দে হযরত আখেরী নবী (সাঃ) শুভাগমন করেছিলেন। (তারীখে ইবনে আসাকির, মুহাম্মদ ইবনেই সহাকের উদ্ধৃতি থেকে ১/১৯,২০ পৃঃ) মোট কথা, যে বছর আসহাবে ফীল কা'বা আক্রমণ করে, সে বৎসরেরই ১২ই রবিউল আওয়াল (১) সোমবার দিনটি দুনিয়ার জীবনে এক অসাধারণ দিবস, যে দিবসে পৃথিবী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য, রাত্র-দিন পরিবর্তনের আসল লক্ষ্য, আদম (আঃ) ও বনি আদমের গর্ব, হযরত নুহ্ (আঃ) এর নৌকার হেফাজতের নিগূঢ় ভেদ, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া এবং মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যৎদ্বানী সমূহের সত্যতা প্রমাণকারী অর্থাৎ আমাদের মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই ধরনীতে শুভাগমণ করেন।

একদিকে পৃথিবীর অর্চনালয়ে নবুওয়তের সূর্য প্রকাশিত হল, আর অন্য দিকে পারস্য রাজ কিস্‌রার রাজ প্রাসাদের (২) ১৪টি গুম্বুজ ধ্বসে পড়ে পারস্যের শ্বেত উপসাগর একেবারে শুকিয়ে যায়, পারস্যের অগ্নি মণ্ডপের হাজার বছরের প্রজ্জলিত অগ্নি স্বেচ্ছায় নিভে যায়, যা কখনও নির্বাপিত হয়নাই।

(সীরাতে মোগলতাই পৃঃ ৫)

মূলতঃ এটি ছিল অগ্নি পূজা ও যাবতীয় গোমরাহীর সমাপ্তির পূর্বঘোষনা এবং পারস্য ও রোম রাজত্বের পতনের ইঙ্গিত।

সহীহ্ হাদীস সমূহে বর্ণিত আছে যে, (৩) মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাবের সময় তাঁর সম্মানীতা মাতার পেট থেকে এমন একটি নূর প্রকাশিত হয় যার দ্বারা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে যায়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে নবীজী (সাঃ) ভূমিষ্ট হয়ে উভয় হাতের উপর ভর দেয়া অবস্থায় ছিলেন অতপরঃ তিনি এক মুষ্টি মাটি তুলে আকাশের দিকে তাকালেন। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া দ্রঃ)

মহানবী (সাঃ) এর সম্মানিত পিতার ইন্‌তিকাল

মহানবী (সাঃ) তখনও জন্ম গ্রহণ করেননি। তাঁর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ্‌কে তদীয় পিতা আঃ মুত্তালিব মদীনা থেকে খেজুর নিয়ে আসার হুকুম

দেন। আব্দুল্লাহ তাঁকে গর্ভাবস্থায় (১) রেখে মদীনায় চলে যায়। সর্বসম্মতিক্রমে সেখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। পিতৃছায়া জন্ম হবার পূর্বেই মাথার উপর থেকে উঠে যায়। −(সীরাতে মোগলতাই পৃঃ ৭)

বাল্যকাল ও দুধপান

সর্বপ্রথম শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর সম্মানীত মাতা এবং কিছু দিন পর আবুলাহাবের বাঁদী সুওয়াইবা দুধ পানকরান। ইহার পর হালীমা সা'দিয়া এই খোদার দেয়া দৌলতের ভাগী হন। −(মাগলতাঈ দ্রঃ)

আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রগুলোর মাঝে সাধারণতঃ এরূপ প্রথা ছিল যে, তাঁরা নিজ শিশুদেরকে দুধ পান করারবার জন্য আশপাশের গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দিত যার দ্বারা শিশুদের শারীরিক সুস্থতা লাভ হত এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষতে পারত এই জন্য গ্রামের মহিলারা দুগ্ধ পোষ্য শিশু সংগ্রহের জন্য প্রায়ই শহরে আসত। হযরত হালমা সা'দিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "আমি সাদ্ সম্প্রদায়ের মহিলাদের সঙ্গে দুগ্ধ পোষ্য শিশু আনার জন্য তায়েফ থেকে মক্কায় রওয়ানা হই। সেই বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। আমার কোলেও একটি বাচ্ছা ছিল। কিন্তু (অভাব ও উপবাসের দরুন) আমার স্তনে এই পরিমাণ দুধ ছিলনা যা তার জন্য যথেষ্ট হত। রাত্রিভর সে ক্ষুধায় ছটফট করত এবং আমরা তার জন্য সারারাত জেগে কাটিয়ে দিতাম। আমাদের একটি উটনী ছিল কিন্তু তারও কোন দুধ ছিলনা।

মক্কা সফরে যে লম্বাকান বিশিষ্ট উটনীর উপর সওয়ার হয়ে ছিলাম, সেটি এতই কমজোর ছিল যে, সকলের সাথে পালা যোগে চলতে পারতনা। এ কারণে সঙ্গীগণও বিরক্ত বোধ করছিল। পরিশেষে কষ্টের সাথেই এই ভ্রমণ সমাপ্ত হল।"

(পূর্বের পৃষ্ঠার টিকা সমূহ) পার্শ্ব টিকা ঃ ১। এ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইবনে আসাকির এই বর্ণনাকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। -১ম খণ্ড পৃঃ ২১ (২) সর্ব সম্মতভাবে মহানবী (সাঃ) এর মোবারক আর্বিভাব রবিউল আওয়াল মাসের সোমবারে হয়েছিল। কিন্তু তারিখ নির্ধারনের ব্যাপারে ৪টি অভিমত প্রসিদ্ধ আছে : যথা− ২, ৮, ১০ ও ১২ তারিখ। হাফিজ মোগলতাঈ ২রা তারিখ এর অভিমতকে গ্রহণ করে অন্যান্য অভিমত গুলিকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত ১২ তারিখ। এমনকি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালনী (রহঃ) এর উপর ইজহার দাবী করেছেন। একেই কামেলে ইবনে আসীরে গ্রহণ করা হয়েছে। মাহবুদ পাশা মিশরী যাহা গণনার মাধ্যমে ৯ তারিখ গ্রহণ করেছেন। তাহার অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য অভিমতের বিরুদ্ধে সনদ বিহীন উক্তি। চন্দ্রোদয়ের স্থান বিভিন্ন হওয়ার কারণে গণনার উপর এমন কোন নির্ভরযোগ্যতার জন্ম হয়না যে, এর উপর ভিত্তি করে জামহুরের বিরুদ্ধাচারণ করা হবে।

(৩) قال الحافظ ابن حجر صححه ابن حبان والحاكم كذا فى المواهب-نشر الطيب-

(১) একটি বর্ণনায় এইরূপ আছে যে, মহানবী (সাঃ) এর জন্মের ৭মাস পর তাঁর পিতার ইনতিকাল হয়েছিল। কিন্তু "যাদুল মাআদ" গন্থে ইবনে কাইয়্যিম (রাহঃ) এই অভিমতকে দুর্বল বরে আখ্যায়িত করেছেন।

মক্কায় যখন পৌছল, তখন যে মহিলাগণই শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখত ও শুনত যে, তিনি এতিম, তখন কেও তাকে গ্রহণ করতো না। (কারণ, তাঁর পক্ষ থেকে বেশী পুরস্কার ও সম্মানী পাওয়ার আশা ছিলনা।) এদিকে হালীমার ভাগ্যতারকা চমকাচ্ছিল। তাঁর দুধের কমতি তাঁর জন্যে রহমতে পরিণত হল। কেননা, দুধের কম্‌তি দেখে কেহই তাকে বাচ্চা দিতে রাজি হয়নি।

হালীমা বলেন, "আমি আমার পতিকে বললাম খালিহাতে ফিরে যাওয়াতে ভাল হচ্ছেনা। খালি হাতে যাওয়ার চেয়ে এই এতীম শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া অনেক ভাল। পতি এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন।" এবং তিনি এই এতিম রত্নটিকে সাথে নিয়ে এলেন যার ফলে শুধু হালীমা ও আমেনার গৃহই নয় বরং পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তাঁর জ্যোতির দ্বারা উজ্জল হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। খোদার ফযলে হালীমার ভাগ্য জেগে উঠল এবং দু'জাহানের সরদার মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর কোলে এসে পড়লেন। তাঁবুতে নিয়ে এসে দুধ পান করতে বসার সাথে সাথে বরকত শুরু হয়ে গেল। স্তনে এই পরিমান দুধ নেমে এল যে, মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর দুধ ভাই তৃপ্তি সহকারে পান করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এ দিকে উটনীর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমার স্বামী উটনীটির দুধ দোহন কররেন এবং আমরা সকলে তৃপ্তিসহ পান করলাম ও রাতভর আরামে কাটালাম। অনেক দিন পর প্রথম রাত এটাই ছিল যে, আমরা শান্তিতে ঘুমিয়েছিলাম। এবার আমার পতিও আমাকে বলতে লাগলেন যে, 'হালীমা! তুমিতো খুবই মোবারক বাচ্চা নিয়ে এলে। আমি বললাম আমারও এই বিশ্বাস যে, এই শিশুটি অত্যন্ত মোবারক হবে। আমরা যখন সেই উটনীর উপর সওয়ার হলাম আল্লাহর কুদরতের লীলা দেখতে লাগলাম, এখন সেই দুর্বল উটনীটি এত দ্রুত চলতে লাগলো যে, কারো বাহন তাঁর নিকট পৌছতে পারছে না। আমার সহগামী মহিলাগণ আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন যে, এটা কি সেই উটনী যার উপর তুমি সওয়ার হয়ে এসেছিলে? যা হোক রাস্তা শেষ হয়ে গেল, আমরাও বাড়ি পৌঁছে গেলাম। সেখানে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ চলছিল। দুগ্ধবতী সমস্ত জন্তুরা দুগ্ধশূণ্য ছিল। আমি ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আমার বকরী গুলির স্তন দুধে ভরে গেল। এখন থেকে আমার বকরীগুলো দুধে ভরপুর হয়ে আসতে লাগল। এবং অন্যেরা তাদের জন্তুগুলি থেকে এক ফোটা দুধও পাচ্ছিল না। আমার কওমের লোকেরা তাদের রাখালগণকে বলতে লাগল, 'তোমরা ও তোমাদের জন্তুগুলিকে ঐখানে ঘাস কাওয়াবে যেখানে হালিমা তাঁর বকরীগুলোকে ঘাস খাওয়ায়। কিন্তু এখানে তো চারণভূমি ও জঙ্গলের কোন চিহ্ন ছিল না; বরং অন্যকোন অমুল্য রত্নের খাতিরে তা মনযুর হয়েছিল। ঐ বস্তু কোথায় পাবে?

সুতরাং ঐ জায়গায় চরা সত্বেও তাদের জন্তুগুলি দুধ শূণ্য এবং আমার বকরীগুলি দুধে পরিপূর্ণ হয়ে বাড়ি ফিরত। এমনি ভাবে আমরা সবসময় মহনবীর (সাঃ) এর বরকতসমূহ দেখতে ছিলাম। এমনকি দুই বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল এবং আমি মহানবী (সাঃ) এর দুধ ছাড়িয়ে দিলাম।" —(আস্-সালিহাত)

মহানবী (সাঃ) এর প্রথম বাক্য ঃ

হযরত হালীমা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যে সময় আমি মহানবী (সাঃ) এর দুধ ছাড়ালাম, তখন তাঁর জবান মোবারকের মধ্যে এই কয়টি বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল ঃ

الله اكبر كبيرا والحمد الله حمدا كثيرا

وسبحان الله بكرة واصيلا—

এবং ইহাই ছিল তাঁর প্রথম বাক্য। (বায়হাকী ও ইবনে আব্বাস ও হতে বর্ণনা করেন।)

মহানবী (সাঃ) এর শারীরিক গঠন প্রণালী অন্য সব বাচ্চাদের থেকে উন্নত ছিল। দুই বৎসর বয়সেই তাঁকে অনেক বড়সড় দেখা যাচ্ছিল। এখন আমরা নিয়মানুযায়ী তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁর বরকতসমূহের কারণে তাঁকে ছেড়ে আসতে মন চায়নি। ঘটনাক্রমে সেই বৎসর মক্কায় প্লেগ বা কলেরার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমরা মহামারীর বাহান করে তাঁকে পূনরায় সাথে নিয়ে এলাম। মহানবী (সাঃ) আমাদের কাছেই রয়ে গেলেন। তিনি ঘরের বাইরে যেতেন এবং ছোট্ট ছেলেদের কে খেলাধূলা করতে দেখতেন, কিন্তু নিজে খেলাধুলা থেকে আলাদা থাকতেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন যে, আমার অন্য ভাইকে দিনভর দেখতে পাইনা, সে কোথায় থাকে? আমি বললাম, সে বকরী চড়াতে যায়। মহানবী (সাঃ) বললেন আমাকেও তার সাথে পাঠাবেন।(১)এর পর তিনি তাঁর দুধ ভাই (আব্দুল্লাহ) এর সাথে বক্‌রী চড়াতে যেতেন। (খাসায়েস্ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৫)

একবার তাঁরা উভয়ে পশুদের মধ্যে ফিরে বেড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঘরে পৌছল এবং তাঁর পিতাকে বলল, আমার কোরাইশ ভাইকে দু'জন সাদা কাপড়ওয়ালা লোক এসে সুইয়ে তাঁর পেট চিরে ফেলেছে। আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে ভয় পেয়ে চারণ ভূমির দিকে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখতে পেলাম, মহানবী (সাঃ) বসে আছেন এবং তাঁর চেহারার রং বদলে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলে তোমার কি হয়েছে?

পার্শ্ব টিকা ঃ (১) শিশু-কিশোর অবস্থায় এমন সাক্ষ্যের আকাংক্ষা লক্ষনীয় যে, "যখন আমার ভাই কাজ করছে তো আমি কেন করবনা।"

তিনি বললেন, দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক এসে আমাকে ধরে শুইয়ে দিল এবং আমর পেট চিড়ে তার মধ্যে কিছু সন্ধান করে বের করল। আমি জানিনা তাতে কি ছিল। আমরা মহানবী (সাঃ) কে ঘরে নিয়ে এলাম। এবং পরে এক গণকের (১) কাছে নিয়েগেলাম। গণক তাকে দেখেই সত্বর নিজ জায়গা থেকে উঠে গেল এবং তাকে আপন বুকে উঠিয়ে নিল আর চিৎকার করে বলতে লাগল "হে আরব বাসীগণ শীঘ্র কর। যে বিপদ সত্বর তোমাদের উপর পৌছার কথা ছিল তা প্রতিহত কর। যার পন্থা হল এই যে, তোমরা এ ছেলেটিকে হত্যাকর এবং আমাকেও তাঁর সাথে হত্যা করে ফেল। যদি তোমরা তাঁকে হত্যা না করে ছেড়ে দাও, তাহলে মনে রেখো, সে তোমাদের ধর্মকে মিটিয়ে দিবে এবং এমন এক ধর্মের প্রতি তোমাদের দাওয়াত দিবে যার কথা তোমরা শোন নাই।"

হালীমা গণকের কথা শুনে শিউরে উঠলেন এবং তাঁকে এই হত ভাগার হাত থেকে টেনে নিয়ে বললেন যে, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তোমার দেমাগ চিকিৎসা করা দরকার। হালীমা তাঁকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ঘটনাটি মহানবী (সাঃ) কে তাঁর সম্মানীতা মাতার নিকট ফিরিয়ে দিতে আসক্ত করল। কেননা তিনি তাঁর যথাযোগ্য হেফাযত করতে পারছিলেন না।

—(আল্লামা জামী (রঃ) কর্তৃক লিখিত শাওয়াহেদুন্ নবুওয়ত ও খাসায়েসে কুব্‌রা দ্রঃ)

মক্কায় পৌঁছে মহানবী (সাঃ) কে যখন তাঁর সম্মানীতা মাতার নিকট অর্পন করলেন, তখন হালীমাকে তিনি বললেন "আগ্রহ ভরে নিয়ে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনার কারণ কি? অত্যধিক পীড়াপীড়ির পর বিবি হালীমার সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে হল। তিনি সব কথা শুনে বললেন, "নিশ্চয়ই আমার ছেলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।" অতপর তিনি গর্ভাবস্থা ও ভুমিষ্ট কালের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী শুনালেন। (ইবনে হিশাম দ্রঃ)

মহানবী (সাঃ) এর সম্মানীতা মাতার ইন্‌তিকাল

যখন মহানবী (সাঃ) এর বয়স চার বা ছয় বৎসর, তখন মদীনা থেকে ফেরার পথে আব্‌ওয়া নামক স্থানে তাঁর সম্মানীতা মাতাও দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। (মোগলতাঈ, পৃঃ ১০)

বাল্যকাল, বয়স ছয় বৎসর। পিতার ছায়াতো পূর্বেই উঠে গিয়েছিল। মায়ের স্নেহের কোলও আজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই এতীম শিশুটি যে

পার্শ্ব টিকা ঃ ১। ইসলামের পূর্বে কিছুলোক জ্বিন বা শয়তান দ্বারা আসমানী খবরাদি ও গুপন কথা বার্তা নিয়ে গায়েবী খবরের দাবীদার হত। তাদেরকে কাহেন বা গনক বলা হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাহম -হাশিয়া যাদুল মাআম্বদ পৃষ্ঠা ৮৮, আল্‌গায়া পৃষ্ঠা ৯৮)

রহমতের কোলে লালন পালন হওয়ার অপেক্ষায় ছিল তিনি তো এই সকল কারণ সমুহের (সহায়সম্বলের) মুখাপেক্ষী নন।

আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল

পিতা-মাতার পর মহানবী (সাঃ) তাঁর দাদা আঃ মুত্তালিবের আশ্রয়ে ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তাআ'লা দেখতে চেয়েছিলেন যে, এই নব জাতক শুধু রহ্মতের কোলেই লালিত পালিত হবে। সমস্ত কার্য কারণের কারক যিনি (আল্লাহ) তিনি স্বয়ং লালন পালনের জিম্মাদার হলেন। যখন তাঁর বয়স আট বৎসর দুই মাস দশ দিন হল, তখন আঃ মুত্তালিবও পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

মহানবী (সাঃ)-এর শামদেশ ভ্রমণ

তারপর মহানবী (সাঃ) এর আপন চাচা আবু তালেব তাঁর অভিভাবক হলেন। এবং তিনি তার আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন। এমন কি তাঁর বয়স বার বৎসর দুইমাস দশদিন হল, তখন আবু তালেব ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম (সিরিয়া) দেশ ভ্রমন করার ইচ্ছা করলেন এবং মহানবী (সাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে শাম দেশের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তাইমা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন।

তাঁর সম্পর্কে এক ইহুদী পন্ডিতের ভবিষ্যৎ বানী

তিনি তাইমা নামক স্থানে অবস্থান করতে ছিলেন, ঘটনা ক্রমে ইহুদী এক বড় পণ্ডিত যাকে বুহায়রা রাহেব বলা হত। সে মহানবী (সাঃ) এর নিকট দিয়ে গমনকালে তাঁকে দেখে আবু তালেবকে সম্বোধন করে বলল "আপনি কি তার প্রতি দয়া পোষন করেন এবং তাঁর হেফাযত কামনা করেন?" আবু তালেব বলল নিশ্চই একথা শুনে বুহায়রা রাহেব আল্লাহর কছম করে বলল যে, "আপনি যদি তাঁকে শাম দেশে নিয়ে যান তাহলে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কেননা, ইনি আল্লাহর নবী যিনি ইহুদী ধর্মকে বিলুপ্ত করে দিবেন। আমি তাঁর গুনাবলী সমূহ আসমানী কিতাবের মধ্যে দেখতে পেয়েছি।"

ফায়দা

বুহায়রা রাহের যেহেতু তাওরাতের বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং মহানবী (সাঃ) কে দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন যে, ইনিই শেষ নবী যিনি তাওরাতকে বিলুপ্ত করবেন এবং ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিতদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। বুহায়রার কথায়, আবু তালেবের মনে ভীতি সৃষ্টি হল এবং তিনি মহানবী (সাঃ) কে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। (মোগলতাঈ, পৃষ্টা ১০)

ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার শাম যাত্রা

মক্কা মু'য়াজ্জমায় হযরত খাদীজা সেই সময় একজন ধনী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতি অভিজ্ঞতা সম্পন্না মহিলা ছিলেন। যে সকল গরীবদেরকে তিনি

সাবধান ও বিশ্বস্ত বরে মনে করতেন। তাঁদের কে তিনি নিজের মালামাল অর্পন করে বলতেন যে, অমুক স্থানে যেয়ে এগুলো বিক্রয় করে আস। তোমাকে এই পরিমাণ (লাভের অংশ) দেয়া হবে।

মহানবী (সাঃ) যদিও তখনও নবুওত প্রাপ্ত হননাই, কিন্তু তাঁর ধর্মপরায়নতা ও বিশ্বস্ততা সারা মক্কাবাসীর নিকট প্রসিদ্ধ ছিল এবং প্রতিটি লোকের তাঁর মনোনীত ও পবিত্র চরিতের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি আল্-আমিন (অতিবশ্বিাসী) উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁর এই সুখ্যাতির কথা খাদীজা (রাঃ) এর নিকট গোপন ছিল না। এজন্যই তিনি চাইয়াছিলেন যে, তাঁর ব্যবসার দায়দায়িত্ব মহানবী (সাঃ) এর উপর অর্পন করে তার বিশ্বাস্ততার দ্বারা উপকৃত হবেন।

তিনি রাসূল্লাহ (সাঃ) এর নিকট বলে পাঠালেন যে, যদি আপনি আমার ব্যবসার মালা-মাল শামে (সিরিয়ায়) নিয়ে যান, তাহলে আমি আমার একটি গোলাম আপনার খেদমতের জন্য সফর সঙ্গী করে দেব এবং অন্যান্য লোকদেরকে যে পরিমাণ লাভের অংশ দেয়া হয় তদপেক্ষা বেশী দিয়ে আপনার খেদমত করব। মহানবী (সাঃ) যেহেতু স্বভাবতঃ সাহসী ও প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে এই দীর্ঘ সফরের জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। খাদিজা (রাঃ আনহা) গোলাম মাইসারাকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ই জিলহজ্জ তারিখে শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে এই মালামাল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্বার সহিত অধিক লাভে বিক্রয় করলেন এবং শাম থেকে অন্যান্য মালামাল ক্রয় করে ফিরে এলেন। মক্কা মো'য়াজ্জামায় পৌঁছে আনীত মাল হযরত খাদীজা (রাঃ) কে অর্পন করলেন। খাদিজা (রাঃ) সেগুলো এখানে বিক্রয় করলে দ্বিগুনের কাছাকাছি লাভ অর্জিত হল।

শামের (সিরিয়ার) পথে মহানবী (সাঃ) যখন এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন, তখন নাসতুরা নামক এক ইহুদী পণ্ডিত তাঁকে দেখতে পেলেন এবং আখেরী যামনার নবী (সাঃ) এর সমস্ত আলামতসমুহ পূর্ব কিতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে তা তাঁর মধ্যে দেখে চিনে ফেললেন। রাহেব মাইসারাকে চিনতেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমার সাথের লোকটি কে"? মাইসারা উত্তরে বলল, তিনি মক্কার অধিবাসী কুরাইশ বংশের একজন ভদ্র যুবক"। নাস্তুরা বললেন, "সময়ে এই যুবক নবী হবেন। (মোগলতাঈ পৃঃ ১২)

হযরত খাদীজা (রা-আনহা) র সহিত বিবাহ

হযরত খাদীজা (রাঃ -আনহা) একজন বিচক্ষনা, বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর ভদ্রতা এবং আশ্চর্যজনক জ্ঞান গরীমা ও চরিত-মাধূর্য দেখে তাঁর মহানবী (সাঃ) এর প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও খালেছ ভালবাসা জন্ম

নিয়েছিল। যার ফলে খাদীজা (রাঃ-আনহা স্বয়ং ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, যদি মহানবী (সাঃ) সম্মতি দান করেন তাহলে তিনি তারই সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। যখন মহানবী (সাঃ) এর বয়স একুশ বৎসর হল তখন হযরত খাদীজা (রাঃ-আনহা)-র সাথে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খাদীজা (রাঃ-আনহা)র বয়স তখন চল্লিশ বৎসর এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে পয়তাল্লিশ বৎসর।

(মোগলতাই)

বিবাহে আবু তালেব, বনু হাশেম এবং মুযার গোত্রের সমস্ত সরদার গণ সমবেত হন। আবু তালেব বিবাহের খুৎবা পাঠ করেন। খুত্‌বায় আবু তালেব মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে যে বাক্যগুলি পাঠ করেছিলেন, সেগুলি অবশ্যই শুনার উপযুক্ত। যার তরজমা এইরূপঃ "ইনি মুহাম্মদ (সাঃ) ইবনে আবদুল্লাহ। যিনি ধন-সম্পদের দিক দিয়া কম হলেও মর্যাদা সম্পন্ন চরিত এবং সার্বিক পরিপূর্ণতার দরুন যে লোককেই তাঁর মোকাবেলায় রাখা হবে, তিনি তাঁর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবেন। কেননা, ধন-সম্পদ এক পতনশলি ছায়া ও প্রত্যাবর্তনশীল বস্তু বিশেষ। আর মুহাম্মদ (সাঃ) যার আত্মীয়তার সম্পর্কের সংবাদ আপনাদের সকলেরই জানা আছে। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন। তাঁর সম্পূর্ণ মুহর মু'আজ্জল (নগদ) হউক কিংবা মুয়াজ্জল (বাকী) হোক তা আমার সম্পদ হতে দিবেন। আল্লাহর কছম, তারপর তিনি অত্যন্ত সম্মান প্রতিপত্তির অধিকারী হবেন।"

আবু তালেবের এইবক্তব্য মহানবী (সাঃ) এর শানে তখন ছিল যখন তাঁর বয়স ছিল একুশ(১) বৎসর এবং প্রকাশ্যভাবে তখনও তাকে নবুওয়ত প্রদান করা হয়নি। অতঃপর এতে আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আবু তালেব তার পুরাতন ধর্ম বিশ্বাসে অটল আছেন, যা বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্যমহানবী (সাঃ) এর সারা জীবন উৎসর্গীকৃত। কিন্তু কথা হল এই যে, সত্য কথা কখনও লুকিয়ে রাখা যায় না।

মোট কথা, হযরত খাদজা (রাঃ-আনহা)র সাথে মহানবী (সাঃ) এর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। তিনি দীর্ঘ ২৪ বৎসর নবীজির খেদমতে ছিলেন। কিছুকাল ওহী নাযেল হওয়ার পূর্বে আর কিছু কাল ওহী নায়েল হওয়ার পরে।

হযরত খাদীজার গর্ভ থেকে মহানবীর (সাঃ) সন্তান

হযরত খাদীজা (রাঃ-আনহা)র গর্ভ থেকে মহানবী (সাঃ) এর দুই ছেলে এবং চার মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ্যবান ছেলেদের নাম কাসেম ও

পার্শ্ব টিকা ঃ ১। ঐ সময় মহানবী (সাঃ) এর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। যথা-২১, ২৯, ৩০, ৩৭. (মোগলতাঈ পৃঃ ১৪) সীরাতে মোস্তফায় বর্ণিত আছে বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বৎসর তাই অধিকাংশের মত।

তাহের। কাসেম (রাঃ) এর নামানুসারেই মহানবী (সাঃ) এর ডাক নাম আবুল কাসেম প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহেরের (রাঃ) সম্পর্কে এও বলা হয় যে তাঁর নাম আবদুল্লাহ(১) ছিল। মেয়ে চার জনের নাম ঃ হযরত ফাতেমা, হযরত যয়নাব, হযরত রুকাইয়া, হযরত উম্মে কুলসুম। হযরত যয়নাব ছিলেন তাঁর সন্তানগণের মধ্যে সবচেয়ে বড়(২)। এ সমস্ত সন্তানগণ হযরত খাদীজা (রাঃ-আনহা)-র গর্ভজাত ছিলেন। অবশ্য মহানবী (সাঃ) এর তৃতীয় ছেলে যার নাম হযরত ইব্রাহিম ছিল তিনি শুধু মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার এই তিন ছেলে বাল্য অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন। অবশ্য হযরত কাসেম (রাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করতে পারার মতো বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।

মহানবী (সাঃ) এর কন্যাগণ

হযরত ফাতেমা (রাঃ-আনহা) উম্মেতের সর্বসম্মতিক্রমে মহানবী (সাঃ) এর মেয়েগণের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তার সম্পর্কে বলেছেন যে, ফাতেমা জান্নাতী মহিলাগণের সরদার। তার বিবাহ পনর বৎসর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে সম্পন্ন হয়। বিবাহ চারশত আশি দেরহাম মহরানা ধার্য হয়েছিল। যাহা প্রায় একশত পঞ্চাশ ভরি রৌপ্য মুদ্রা ছিল। এই সাইয়্যিদাতুন নিছার (মহিলাদের নেত্রী) জাহিস (যা কন্যাকে পিতা বন্ধোবস্ত হিসাবে দিয়ে থাকেন) ছিল একটি চাদর, খেজুর গাছের ছালে ভরা একটি বালিশ, একটি চামড়ার গদি, একটি দড়ির খাট, একটি মোশক (চামড়ার তৈরী পাত্র) এবং একটি আটার চাক্কী। (তবকাতে ইবনে সাদ) চাক্কী পেষণসহ ঘরের সবকাজ নিজ হাতেই করতেন। এ ছিল দু জাহানের সরদার আখেরী নবী (সাঃ) এর সব চেয়ে আদরের কণ্যার বিবাহ, জাহিম, এবং মহরানা। আর তার দারিদ্র পীড়িত জেন্দেগী নক্সাও ছিলতা। এসব দেখে ও কি ঐ সব মহিলারা লজ্জা বোধ করবেনা যারা বিবাহ শাদীর আনুষ্ঠানিকতায় নিজ দ্বীন ও দুনিয়াকে বরবাদ করে দেয়? (৩) মহানবী (সাঃ) এর পুত্র সন্তান জীবিত না থাকার মধ্যে

১। যাদুল মাআদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তার আসল নাম আব্দুল্লাহ ছিল। তৈয়ব ও তাহের এই দুইটি ছিল তার উপাধি।

২। হাফেজ ইবনে কাইয়্যম "যাদুল মাআদ" গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। কেহ কেহ হযরত যয়নাবকে, কেহ হযরত রুকাইয়াকে কেহ হযরত কুলসুমকে সবচেয়ে বড় বলে মত প্রকাশ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত রুকাইয়া সব চেয়ে বড় ছিলেন ও উম্মে কুলসুম সর্বকণিষ্ঠা ছিলেন। (যাদুল মায়াদ প্রথম খন্ড ২৫ পৃষ্ঠা)

৩। হযরত ফাতেমা (রাঃ-আনহা) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাওঃ সাইয়্যিদ আসগর হোসাইন (রহঃ) কর্তৃক ও কুতুব খানা এমদাদীয়া, দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত "নেক বীবিয়া" নামক গ্রন্থখানা পাঠ করতে পারেন। তাতে ঈমান সতেজ হবে।

আল্লাহর বিরাট হেকমত নিহিত রয়েছে। শুধু কন্যাগণের মধ্যে শুধু হযরত ফাতেমা (রা-আনহার)র সন্তানগণই অবশিষ্ট ছিল। অন্যান্য কণ্যাগণের মধ্যে কারো সন্তান হয় নাই। আবার কারো সন্তান জীবিত থাকেন নাই।

হযরত যয়নাব (রাঃ-আনহার)র বিবাহ আবুল আস ইবনে রবীর সাথে হয়েছিল। তাদের একটি ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে অল্প বয়সেই ইন্তিকাল করেন। এবং একটি কণ্যা সন্তান ছিল। যার নাম উমামা। হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ-আনহা)র ইন্তিকালের পর তাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তার কোন সন্তান হয় নাই।

হযরত রুকাইয়া হযরত উসমান গনি (রাঃ)এর সহিত পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং হাবসায় হিযরতের সময় তারই সাথে চলে যান। হিজরী ২য় সনে বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় নিঃসন্তান অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তারপর হিযরী ৩য় সনে তাঁরই বোন উম্মে কুলসুমকে মহানবী (সাঃ) হযরত উসমানের সাথেই বিবাহ দেন। এ কারণেই তাঁর উপাধি যীন নুরাঈন (দুইনুরের অধীকারী)। হিযরী নবম বর্ষে হযরত উম্মে কুলসুমও ইন্তিকাল করেন। সেই সময় মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন যে, "যদি আমার তৃতীয় আর কোন মেয়ে থাকতো তাহলে তাকেও হযরত উসমানের নিকট বিবাহ দিতাম।" (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠ ১৬/১৭)

মহিলাগণ মনে রাখবেন

সীরাতের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে যে, একবার হযরত রুকাইয়া উসমান (রাঃ) এর উপর নারায হয়ে মাহনবী (সাঃ) এর খেদমতে অভিযোগ করতে এলেন। রহমতে আলম (সাঃ) বলেন, "স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে এটা আমি পছন্দ করিনা। যাও, সোজা ঘরে ফিরে যাও"। এটাই ছিল কন্যার প্রতি পিতার শিক্ষা, যাতে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ঠিক হয়ে যায়।

(আওজাযুস্ সিয়ার লি-ইবনে ফারেছ দ্রঃ)

অন্যান্য সচ্চরিত্রা বিবিগণ

মহানবী (সাঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ-আনহা) এর জীবদ্দশায় অন্য কোন মহিলা কে বিবাহ করেন নাই। হিযরতের তিন বৎসর পূর্বে যখন হযরত খাদিজা (রা-আনহা) ইন্তিকাল করেন। এবং মহানবী (সাঃ) এর বয়স ঊনপঞ্চাশ বৎসরে পৌছল, তখন আরও কয়েকজন সচ্ছরিত্রা মহিলা তাঁর সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। যাদের পবিত্র নাম নিম্নে বর্নিত হল।

২। হযরত সাওদা বিন্তে যাম্আহ্ (রা-আন্হা)

৩। হযরত আয়েশা (রাঃ-আন্হা)

৪। হযরত হাফ্‌সা (রাঃ-আন্‌হা)
৫। হযরত যয়নাব বিনতে খুযাইমা (রাঃ-আন্‌হা)
৬। হযরত উম্মে ছালমা (রাঃ-আন্‌হা)
৭। হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ-আন্‌হা)
৮। হযরত জুওয়াই রিয়াহ্ (রাঃ-আন্‌হা)
৯। হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ-আন্‌হা)
১০। হযরত সুফিয়া (রাঃ-আন্‌হা)
১১। হযরত মাইমুনা (রাঃ-আন্‌হা)

তারা মোট এগার জন। যাঁদের মধ্যে দুইজন মহানবী (সাঃ) এর পূর্বে ইন্‌তিকাল করেছেন এবং নয়জন তাঁর ওফাতের সময় জীবিত ছিলেন। তা উম্মতের ঐক্য মতে শুধু মহানবী (সাঃ) এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। উম্মতে মুহাম্মদী এর জন্য চার জন থেকে বেশী স্ত্রী একই সময় বিবাহে আবদ্ধ করা বৈধ নয়। মহানবী (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্যের কোন কোন কারণ সামনে বর্ণনা করা হবে।

হযরত সাওদা (রাঃ-আন্‌হা)

তিনি প্রথমে সাকরান ইবনে আমেরের বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। অতঃপর মহানবী (সাঃ) এর সাথে বিবাহ্ সূত্রে আবদ্ধ হন।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ-আন্‌হা)

(১) তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কন্যা। ছয় বৎসর বয়সে মহানবী (সাঃ) এর সাথে বিবাহ্ হয় এবং প্রথম হিজরী সনের নয় বৎসর বয়সে তাঁর রুখ্‌সতী (স্বামীর বাড়ীতে উঠাইয়া নেওয়া) কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) এর ওফাতের সময় তাঁর আঠার বৎসর বয়স ছিল। মহানবী (সাঃ) এর নয় বৎসর সাহচর্য তাঁর উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তিনি কি অর্জন করেছিলেন, তা মহান সাহাবী গণের উক্তি থেকে অনুধাবন করা যায়। সাহাবী গণ বলতেন, "যখন কোন মাসয়ালা আমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হত, তখন আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার নিকট সমাধান পেতাম"। এই কারণে প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের অনেকেই তাঁর শিষ্য ছিলেন।

হযরত হাফ্‌সা (রাঃ-আন্‌হা)

তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর কন্যা ছিলেন। প্রথমে উনাইস ইবনে হুযাইফার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সনে মহানবী (সাঃ) এর সাথে বিবাহ হয়। (মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৪৮)

পার্শ্বটিকা ঃ (১) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ-আন্‌হা) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে "নেকী বীলিয়া" নামক গ্রন্থ খানা পাঠ করবেন।

হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মা হেলালিয়া (রাঃ-আন্হা)

তিনি উম্মুল মাসাকীন (মিসকিনদের মা) নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমত তুফায়েল ইবনে হারেসের সাথে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি তাঁকে তালাক দিলে পর তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহর সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি যখন উহুদ যুদ্ধে ১মাস পূর্বে শহীদ হয়ে যান তখন হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের এক মাস পূর্বে মহানবী (সাঃ) এর সাথে তার বিবাহ হয়। (সীরাতে মোগলতাই, পৃষ্ঠা-৪৯) এবং মাত্র দুই মাস ঘর সংসার করার পর ইন্তিকাল করেন। (নশরুত্বীব)

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ-আন্হা)

তিনি হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর কন্যা। প্রথমে উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে বিবাহ হয়। উবায়দুল্লাহর তরফ থেকে সন্তানাদিও হয়। তাঁর স্বামী স্ত্রী দুইজনই মুসলমান হয়ে হাবশায় হিযরত করে ছিলেন। সেখানে পৌঁছে উবায়দুল্লাহ্ খ্রীষ্টান হয়ে যায় এবং উম্মে হাবীবা নিজ ঈমান আকীদার উপর অটল থাকেন। সে সময় মহানবী (সাঃ) হাবশার বাদশাহ্কে একটি পত্র লিখে পাঠালেন যে, মহানবী (সাঃ) এর পক্ষ হতে উম্মে হাবীবাকে যেন বিবাহের প্রস্তাব দেন। সুতরাং নাজ্জাসী বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং নিজেই বিবাহের অভিভাবক হয়ে চারশত দীনার মহরানা নিজেই আদায় করে দেন।

হযরত উম্মে সাল্মা (রাঃ-আন্হা)

হযরত উম্মে সাল্মা (রাঃ-আন্হা)র নাম ছিল হিন্দা। প্রথমে আবু সাল্মার বিবাহে ছিলেন। তাঁর পক্ষ হতে সন্তানও ছিল। হিজরতের চতুর্থ বর্ষে এবং কোন বর্ণনায় তৃতীয় বর্ষে জুমাদাস্ সানী মাসে মহানবী (সাঃ) এর বিবাহে আসেন। —(সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৫)

বলা হয়ে থাকে যে, হযরত উম্মে সাল্মা (রাঃ-আন্হা) সমস্ত পবিত্রতমা বিবিগণের পরে ইন্তিকাল করেছিলেন।

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ-আন্হা)

ইনি মহানবী (সাঃ) এর ফুফুর কন্যা ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে যায়েদ ইবনে হারেসার নিকট বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যায়েদ যেহেতু গোলাম ছিলেন এজন্য যয়নাব (রাঃ-আন্হা) এই সম্বন্ধ পছন্দ করলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) এর হুকুম পালনার্থে রাজী হয়েছিলেন। এক বৎসরের কাছাকাছী হযরত যায়েদের বিবাহধীনে ছিলেন। কিন্তু যেহেতু মানসিক বনিবনা হচ্ছিলনা তাই সব সময় তাদের মধ্যে মনমালিন্য লেগেই থাকত। এমন কি হযরত যায়েদ (রঃ) হুজুর (সাঃ) খেদমতে হাজির হয়ে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে বুঝিয়ে তালাক প্রদান হইতে বিরত

রাখেন। কিন্তু তারপরেও যখন কিছুতেই বনিবনা হচ্ছিলনা, তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) বাধ্য হয়ে তাকে তালাক প্রদান করেন। তিনি যখন মুক্ত হলেন, তখন মহানবী (সাঃ) তাঁর শান্তনা ও মন সন্তুস্টির জন্য তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু সে সময় আরবে পালক পুত্রকে নিজের ঔরষজাত পুত্র সন্তানের বরাবর মনে করা হত। সে জন্য মহানবী (সাঃ) সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে বিবাহ করা হতে বিরত ছিলেন। লোকেরা হয়তো এই কথা বলবে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) পুত্র বধুকে বিবাহ করে ফেলেছেন। কিন্তু যেহেতু তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব। এজন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হল ঃ "আপনি কি লোক দিগকে ভয় করছেন? অথচ আল্লাহকেই একমাত্র ভয় করা উচিত"। —(সূরা আহ্যাব)

চতুর্থ হিজরী অথবা কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তৃতীয় হিজরীতে আল্লাহ্র হুকুমে মহানবী (সাঃ) স্বয়ং তাঁকে বিবাহ করেন। যেন মানুষ বুঝতে পারেন যে, পালক পুত্র ঔরষজাত পুত্রের হুকুম বা পর্যায় নয়।

পালক পুত্রের বিবি বিবাহ বিচ্ছেদের পর পালক পিতার জন্য হারাম নয় এবং যে সব লোকেরা আল্লাহর এই হালালকে বিশ্বাস গত বা আমল গত হারাম করে রেখেছে তারা যেন আগামীতে এই ভূল ধারণা থেকে বাহির হয়ে আসে। এ জাহেলীয়াতের কুপ্রথা সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রাচীন কুপ্রথার উৎপাটন তখনই সম্ভব ছিল যখন মহানবী (সাঃ) স্বয়ং কার্যতঃ ইহা বাস্তবায়ন করেন।

হযরত যয়নব (রাঃ-আন্হা) এর বিবাহ সম্পর্কে আমি যা লিখেছি তা অত্যন্ত সহীহ হাদীসের বর্ণনার দ্বারা লিখেছি। যা সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাফেজে হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী বর্ণনা করেছেন।

(কিতাবুল বারী, তাফসীরে সূরা আহ্যাব দ্রঃ)

এতদ্ব্যতীত সে সমস্ত ভ্রান্ত বর্ণনা সমুহ রটানো হয়েছে ঐ সবই মুনাফেক ও কাফেরদের বানানো বা অলীক রটনা। যে ভ্রান্ত ঘটনা বর্ণনা রয়েছে সেগুলি শুধু মিথ্যা ও কল্পিত অপবাদ মাত্র।

হযরত সুফিয়া বিনতে হোয়াই (রাঃ-আন্হা)

তিনি হযরত হারুন (আঃ) এর বংশধর। এ শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট ছিল যে, তিনি একজন নবীর কন্যা এবং একজন নবীর বিবি ছিলেন। প্রথমে কেনানা ইবনে আবিল হাকীকের বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। মৃত্যুর পরে মহানবী (সাঃ) এর বিবাহে আসেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস খোযাইয়া (রাঃ-আনূহা)

তিনি বনি মুস্তালেকের সরদার হারেসের কন্যা। যুদ্ধবন্দী অবস্থায় মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে আসেন। অতঃপর মহানবী (সাঃ) তাঁকে বিবাহ করেন। ইহার বদলায় তাঁর গোত্রের সমস্ত লোক মুক্তি লাভ করে এবং তাঁর পিতা মুসলমান হয়ে যান।

হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস হেললিয়া (রাঃ-আনূহা)

প্রথমে মাসউদ ইবনে ওমরের বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁকে তালাক প্রদান করার পর আবু রেহাম তাঁকে বিবাহ করেন। আবু রেহামের ইন্তিকালের পরে মহানবী (সাঃ) তাকে বিবাহ করেন। —(মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৬৬)

ইনি মহানবী (সাঃ) এর সর্বশেষ বিবি ছিলেন। তাঁর পর তিনি আর কোন বিবাহ করেন নাই। উল্লেখিত বিবিগণ ছাড়াও আরো কোন কোন মহিলাগণের সাথে মহানবী (সাঃ) এর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সাথে হুজুর (সাঃ) এর সম্মনিত সাহচর্য লাভ হয় নাই। বরং রুখসতী কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। বিবরণ সীরাতের বড় বড় কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বহু বিবাহ সম্পর্কে জরুরী নসীহত

একজন পুরুষের জন্য একের অধিক স্ত্রী রাখা ইসলামের পূর্ব দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মে বৈধ বলে মনে করা হত। আরব, হিন্দুস্থান, ইরান, মিশর, ইউনান, (গ্রীক) বাবেল, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের প্রত্যেক কওমের মধ্যে অনেক বিবাহের প্রথা চালু ছিল। এবং এই স্বভাবগত প্রয়োজনীয়তাকে আজও কেহ অস্বীকার করতে পারেনি। বর্তমান যুগে ইউরোপীয়গণ তাদের পূর্বপুরুষের বিরুদ্ধে বহু বিবাহকে অর্থনৈতিক বলার প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু সফলকাম হতে পারে নাই। অবশেষে স্বাভাবিক নীতির বিজয় হয়েছে এবং বর্তমানে ও তা প্রচলনের প্রচেষ্টা চলছে।

প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান পণ্ডিত মিঃ ডেভিট পোর্ট বহু বিবাহের সমর্থনে ইঞ্জিলের অনেক আয়াত বর্ণনার পর লিখছেন, "এই আয়াত সমূহ থেকে একথা পাওয়া যায় যে, একাধিক বিবাহ শুধু পছন্দনীয়ই নয় বরং খোদা তা'আলা তাতে খাছ বরকত দিয়েছেন।"

(১) (লাইফ জন ডেভিন পেটি দ্রঃ) অবশ্য এখানে একটি বিষয় দেখার যোগ্য যে, ইসলামের পূর্বে বহু বিবাহের কোন সীমা নির্ধারিত ছিলনা। এক এক ব্যক্তির অধিনে হাযার হাযার (২)মহিলা থাকত। খ্রীষ্টান প্রাদ্রীরা বহু বিবাহে

পার্শ টিকা ঃ ১। এমনি ভাবে পাদ্রী ফিক্স জন মিল্টন ও আইজ্যাক টেকর ইত্যাদি ব্যক্তিগণ জোড় ভাষায় একাধিক বিবাহের উপর সমর্থন দিয়েছেন।

২। প্রচলিত বাইবেল পাঠে জানাযায় যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সাত স্ত্রী এবং তিনশত বাঁদী ছিল। (প্রথম সালাতীন ১১/৩) হযরত দাউদ (আঃ) এর নিরান্নব্বই জন স্ত্রী, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর তিন স্ত্রী এবং ইয়াকুব (আঃ) ও হযরত মুসা (আঃ) এর চার জন করে স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন।

অত্যন্ত ছিল। ষোল'শ খ্রীষ্টব্দ পর্যন্ত জার্মানে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কনষ্টান্টিনোপলের রাজাও তার উত্তরসূরীরা বহু স্ত্রী গ্রহণ করেছিল।

ঠিক এমনিভাবে হিন্দুদের বেদ নামক গ্রন্থের শিক্ষার বহু বিবাহ বৈধ ছিল এবং তাঁতে একই সময় দশজন, তের জন, সাতাইশ জন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে(১)।

মোট কথা ইসলামের পূর্বে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের ও ধর্মীয় ইতিহাস পাঠে জানাযায় যে, ইহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, আর্য এবং পারসিক কোন ধর্ম্ বা আইন- কানুন ইহার কোন সীমা রেখা নির্ধারন করে নাই। ইসলামের প্রাথমিক যমানায় ও এই প্রথা এমনিভাবে সীমা রেখা ছাড়াই প্রচলিত ছিল। কোন কোন সাহাবায়ে কেরামের বিবাহে চারজনের থেকেও বেশী স্ত্রী ছিল। হযরত খাদীজা (রাঃ-আন্‌হা) এর ইন্‌তিকালের পর মহানবী (সাঃ) এর বিবাহের বিশেষ বিশেষ ইসলামী প্রয়োজনে দশজন পর্যন্ত স্ত্রী একত্রিত হয়েছিল। তারপর যখন বহু বিবাহের কারণে মহিলাদের অধিকার খর্ব হতে লাগল, মানুষতো প্রথমতঃ লোভের বর্শবর্তী হয়ে অধিক বিবাহ করত কিন্তু পরে মহিলাগণের হক আদায় করতে পারত না। কুরআনে আযীমের চিরস্থায়ী বিধান যা দুনিয়া থেকে জোর-জুলুমকে বিলুপ্ত করে দিবার জন্যই নাযিল হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় নাই। কিন্তু খারাপীগুলির সংশোধনে এক সীমা নির্ধারণ করে ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হল যে, "এখন তোমরা চারজন স্ত্রীকে একই সাথে বিবাহ করতে পারবে। তাও আবার এই শর্তে যে, যদি সমান ভাবে সকলের হক আদায় করতে পার। যদি না পার তাহলে একাধিক স্ত্রী রাখা অন্যায়।"

এই নির্দেশের পরে চারজন থেকে বেশী স্ত্রী রাখা উম্মতের ঐক্যমতে হারাম প্রমাণিত হল। যে সকল সাহাবীর বিবাহে চারের অধিক বিবি ছিল তাঁরা চারের অতিরিক্ত স্ত্রীগণকে তালাক প্রদান করেন। হাদীস শরীফে আছে, হযরত গায়লান যখন মুসলমান হলেন তখন তাঁর বিবাহে দশজন স্ত্রী ছিল। মহানবী (সাঃ) তাঁকে হুকুম প্রদান করেন যে, চারজন রেখে অতিরিক্ত স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দাও।

পার্শ টিকা ঃ ১। মনুজী যাহাকে হিন্দু ও আর্যদের সর্বজনে মান্য ও নেতা বলে মান্য করা হয় তিনি ধর্ম শাস্ত্রে লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তির চার পাঁচজন স্ত্রী থাকে এবং তাদের মধ্যে একজন সন্তানবতী হয়, তাহলে বাকী অন্যান্য স্ত্রী গুলিকেও সন্তানবতী বলা হয়। (মনু অধ্যায় ৯, শ্লোক ১৮৩ রেসালায়ে তা'আদ্দুদে আযওয়াজ, অমৃতসর) শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত অবতার বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহার হাজার হাজার স্ত্রী বিদ্যমান ছিল।

এমনিভাবে হযরত নওফল ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) যখন মুসলমান হলেন, তখন তার বিবাহে পাঁচজন স্ত্রী ছিল। মহানবী (সাঃ) তাদের একজনকে তালাক দান করার হুকুম দিলেন। (তাফসীরে কবীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭)

মহানবী (সাঃ) এর পবিত্রতমা বিবিগণের সংখ্যা ও এই সাধারণ আইনানুযায়ী চারজনের বেশী না থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু একথা প্রকাশ থাকে যে, উম্মাহাতুল মো'মেনীন (মুমিনদের মাতাগণ) অন্যান্য মহিলাগণের মত নন। কুরআন করিম স্বয়ং ঘোষণা করেছে–

يانساء النبى الستن كاحد من النساء

হে নবীর বিবিগণ! তোমরা সাধারণ মহিলাগণের মত নও।" তারা সমস্ত উম্মেতের মাতা। মহানবী (সাঃ) এর পর তারা কারো বিবাহে আসতে পারেনা। এখন যদি সাধারণ আইনে আওতায় চারজন বিবি ছাড়া বাকী বিবিগণকে তালাক দিয়া আলাদা করা হত তাহলে তাদের উপর কতইনা যুলুম করা হত যে, এখন তারা সারা জীবন নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে হত এবং রাহ্মাতুললিল্ আলামীন (সাঃ) এর সামান্য কদিনের সাহচার্য তাদের জন্য আযাবের পরিণত হত। এদিকে তো ফখরে আলম (সাঃ) এর সহচার্য ছুটে যেত। আবার অন্য দিকে তাদের কোথাও দুঃখ মোচনের অনুমতিও থাকত না।

এজন্যই মহানবী (সাঃ) এর বিবিগণকে সাধারণ আইনের আওতায় আনা কোন মতেই সমীচিন ছিলনা। বিশেষতঃ সমস্ত মহিলা গণের বিবাহ এ জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, তাদের স্বামীগণ জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে ছিলেন এবং তাদের সহমর্মিতার জন্যই তাদেরকে বিবাহ করেছিলেন। এখন যদি তাদেরকে তালাক দেওয়া হত তাহলে তাদের কি অবস্থা হত। ইহা কি সঠিক সহমর্মিতা হত যে, এখন তারা সারা জীবনের জন্য বিবাহ হতে বঞ্চিত হয়ে যেতেন? এজন্যই শরীয়তের হুকুমে চার জনের বেশী স্ত্রী রাখা শুধু মহানবী (সাঃ) এরই বিশেষত্বে পরিগনিত হল। এ ছাড়া তার সাংসারিক জীবনের অবস্থা সমূহ যা উম্মতের জন্য ইহকাল ও পরকালে যাবতীয় কাজ কর্মের বিধিবদ্ধ আইন রূপে গণ্য তা শুধু পবিত্রতমা বিবিগণের দ্বারাই পৌঁছতে পারত এবং তা এমন একটি উদ্দেশ্যে যে, এর জন্য নয়জন বিবিও কম ছিল। এই বাস্তব অবস্থার উপর লক্ষ্য করে কোন মানুষকি একথা বলতে পারে যে, মহানবী (সাঃ) এর এই বৈশিষ্ট (নাউযুবিল্লাহ) জৈবিক লোভ লালসার উপর নির্ভরশীল ছিল?

এর সাথে একথাটিও লক্ষ্যনীয় যে, সে সময় সারা আরব ও অনারব মহানবী (সাঃ) এর বিরোধিতায় দাড়িয়েছিল। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

করেছিল। তাঁর উপর নানা রকমের দোষ ও অপবাদ আরোপ করে তাকে পাগল, মিথ্যাবাদী বলেছিল। মোট কথা, এই দেদীপ্যমান সূর্যের উপর ধুলাবালি নিক্ষেপ করার জন্য সকল প্রকারের শক্তি প্রয়োগ করে নিজেরাই লাঞ্চিত হচ্ছিল। এত কিছু করেছিল কিন্তু কোন শত্রু কি কোন দিন তার উপর জৈবিক লোভ-লালসা এবং নারী সংগঠিত ব্যাপারে কোন অবিযোগ তুলতে পেরেছিল? না অবশ্যই পারেনি। এ ব্যাপারে কোন লোকের বদনাম করার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন হাতিয়ার ছিলনা। যদি সামান্য আঙ্গুল রাখিবার সুযোগ হত তাহলে আরবের কাফেরেরা যাদের নিকট নবীর ঘরের খরব পর্যন্ত গোপন ছিলনা, তারা সবচেয়ে বেশী অনুসন্ধান করে একে তাঁর দোষ-ত্রুটির মধ্যে গণ্য করত। কিন্তু তরা এত কথার গ্রহণ যোগ্যতাকে নস্যাৎ করে দিবে। কেননা পরহেজগারীর মূর্ত প্রতীক মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র জীবন মানুষের চোখের সামনে ছিল। যার মধ্যে তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, মহানবী (সাঃ) এর যৌবন কালের বড় অংশটি তো শুধু একাকীত্ব ও নির্জনতার মধ্যে অতিবাহিত হল। তার পর যখন তার বয়স ১৫ বৎসরে পৌঁছল তখন হযরত খাদীজা (রাঃ-আন্হা)র পক্ষ হতে বিবাহের প্রস্তাব এল যিনি বিধবা ও সন্তানবতী হওয়ার সাথে সাথে ৪০ বৎসরে উপনীত হয়ে বাধ্যর্ক্যের যমানা অতিক্রম করছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে বিবাহের পূর্বে দুইজন পতির সংসার করেছিলেন এবং দুই ছেলে তিন মেয়ের মা হয়েছিলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১২)

মহানবী (সাঃ) এর পক্ষ হতে তার প্রস্তাব বানচাল করা হয় নাই। অতঃপর বেশী ভাগ বয়সই এই বিবাহে কাটিয়েছেন। তাও আবাঁর এমনভাবে যে, হযরত খাদীজাকে ঘরে রেখে হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় এক এক মাস পর্যন্ত শুধু আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। জীবনের বড় অংশ এই বিবাহেই কাটিয়েছেন। এজন্য তার যত সন্তানাদি জন্ম হয়েছিল তাদের সবাই হযরত খাদীজা (রাঃ–আন্হা) এর গর্ভজাত ছিলেন।

অবশ্য হযরত খাদীজা (রাঃ-আন্হা)র ওফাতের পর তার বয়স যখন পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করল, তখন এই সব কটি বিবাহ সংঘটিত হয় এবং শরীয়তের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের আওতায় দশজন পর্যন্ত মহিলা তার বিবাহে আসেন। যারা (হযরত আয়েশা (রাঃ-আন্হা) ছাড়া সবাই ছিলেন বিধবা। আর কেহ কেহ সন্তানবতীও। এই সব অবস্থা পরিলক্ষিত হয়ে আমি ধারণাও করতে পারিনা যে, কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোক মহানবী (সাঃ) এর এই কাধিক বিবাহ কে (নাউযবিল্লাহ) জৈবিক লোভ-লালসার ফলাফল বলে মন্তব্য করতে পারে। যদি কোন রাতকানা নবুওয়ত সূর্যের জ্যোতিও মহত্বকে না দেখে এবং মহানবী (সাঃ) এর চরিত, কর্ম, পরহেজগারী, পবিত্রতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং পূতপবিত্র জিন্দেগীর সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে চক্ষু

বন্ধ করে রাখে, তাহলে স্বয়ং এই একাধিক বিবাহের সাথে জড়িত ঘটনাবলীও অবস্থা সমুহই একথা বলতে বাধ্য করবে, এই একাধিক বিবাহ নিশ্চয়ই কোন মনের খাহেশের উপর নির্ভরশীল ছিলনা। নতুবা সারা জীবন এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে অতিবাহিত করে প্রায় পঞ্চশ বৎসর বয়সকে এই কাজের জন্য নির্ধারিত করা কোন মানুষের জ্ঞান মেনে নিতে পারে না।

বিশেষ করে যখন আরবের কাফেরকুল ও কুরাইশ সরদারগণ তাঁর ইঙ্গিত মাত্রই নিজেদের নির্বাচিত লাবন্যময়ী সুন্দরীকে তাঁর পদতলে উৎসর্গ করে দিতেও তৈরী ছিল। যেমনটি সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভর যোগ্য কিতাবাদিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত তখন মুসলমানের সংখ্যাও লাখের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল যাদের প্রতিটি মহিলা মহানবী (সাঃ) এর পত্নী হওয়াটাকে সঙ্গত কারনেই দু'জাহানের কামিয়াবী মনে করতেন। এই সবকিছু থাকা সত্বেও মহানবী (সাঃ) এর পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শুধু হযরত খাদীজা (রাঃ-আন্হা)ই ছিলেন তার পত্নি। যার বয়স বিবাহের সময়ই চল্লিশ বৎসর ছিল। তারপর যে সকল মহিলাকে বিবাহের জন্য মনোনীত করা হয়। তাদের একজন ব্যতিত সকলেই ছিলেন বিধবা এবং সন্তানের মাতা। উম্মতের অসংখ্য কুমারী মহিলাদিগকে তখনও নির্বাচিত করা হয়নি।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিস্তারিত লেখার সুযোগনেই। নতুবা দেখিয়ে দেয়া যেত যে, মহানবী (সাঃ) এর একাধিক বিবাহ কি পরিমান ইসলাম ও শরীয়ত সঙ্গত প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত বা নির্ভরশীল ছিল। এমন কি যদি নবী পত্নীগণ না হতেন, তাহলে সে সব আহ্কাম যাহা শুধু মহিলাগণের মাধ্যমেই উম্মতের নিকট পৌঁছানো সম্ভব ছিল তা অজানাই থেকে যেত।

কি পরিমণ নির্লজ্জ ও সত্যঘাতী কথা যে, যদি মহানবী (সাঃ) এর একাধিক বিবাহ কে লোভ লালসার ফলশ্রুতি আখ্যায়িত করা হয়। অন্যায় প্রীতি যদি কাউকে অন্ধ না করে থাকে, তাহলে কোন কাফেরও এমন কথাটি বলতে পারেনা।

মহানবী (সাঃ) নয়জন পবিত্রতমা বিবি পরিত্যাগ করে ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম পবিত্রতমা বিবিগণের মধ্যে থেকে হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ-আন্হা) ইন্তিকাল করেন এবং সর্ব শেষে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ-আন্হা) ইন্তিকাল করেন।

মহানবী (সাঃ) এর চাচা ও ফুফুগণ

আব্দুল মুত্তালিবের দশ পুত্র ছিলেন। (১) হারিশ, (২) যোবায়ের, (৩) হাযল, (৪) দিরার, (৫) মুকাওভিম, (৬) আবু লাহাব, (৭) আব্বাস, (৮)

হামযা, (৯) আবু তালেব, (১০) আব্দুল্লাহ, এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ তাঁর সম্মানীত পিতা। অবশিষ্ট নয় জন তার চাচা। হযরত আব্বাস ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন। তার ফুফূ ছিলেন ছয়জন। (১) উমায়মা, (২) উম্মে হাকীম, (৩) বার্‌রা, (৪) আতিকা, (৫) সুফিয়া, (৬) আরওয়া।

মহানবী (সাঃ) এর পাহারাদারগণ

হযরত সা'দ ইবনে মো'আয বদরের যুদ্ধে হযরত যাক্‌ওয়ান ইবনে আবদে কায়েস (রাঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে সালমা আন্‌সারী (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে, হযরত যোবায়ের (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে, হযরত ইবাদ ইবনে বশীর (রাঃ) ও সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) আবু আইউব (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ) প্রমূখ সাহাবীগণ ওয়াদীকুরার যুদ্ধে পাহারাদারী করেন। এবং যখন এই আয়াতে কালীমা নাযিল হল অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার হেফাজত করবেন," তখন থেকে পাহারাদারীর ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়।

কাবা ঘর নির্মাণ ও কুরাইশদের কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে সর্বসম্মতিক্রমে আল-আমীন স্বীকৃতি দান ঃ

মহানবী (সাঃ) এর বয়স যখন পয়ত্রিশ বৎসর হল তখন কুরাইশগণ বায়তুল্লাহকে নতুন করে মেরামত করার ইচ্ছা করল(১)। বায়তুল্লাহর মেরামত কাজে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক মানুষ নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করত। কুরাইশ বংশের প্রতিটি শাখা গোত্র নিজেদের সৌভাগ্যের ফয়সালা এর উপর করত যে, বায়তুল্লাহ মেরামত কাজে কে কত অংশ নিতে পারে। সুতরাং এই মেরামত কাজে কোন ঝগড়া যেন না হয়। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত গোত্র সমূহের মধ্যে মেরামত কার্যকে বন্টন করে দিলেন। এ বন্টন পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ মেরামাত কাজ 'হাজারে আসওয়াদ' বসাবার স্থান পর্যন্ত পৌছে গেল। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ কে উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার ব্যাপারে গোত্র সমূহের মধ্যে চরম মতানৈক্য দেখা দিল। প্রত্যেক গোত্র ও ব্যক্তির খাহেশ ছিল যে, এই সৌভাগ্য অর্জন কিভাবে করা যায়। এমন কি তা নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে অঙ্গিকার নিতে লাগল। কওমের চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্গ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি মীমাংসার পন্থা বের করতে মসজিদে সমবেত হলেন। আলাপ আলোচনায় (মুশবেরায়) এই ফয়সালা হল যে, যে ব্যক্তি আগামী কাল ভোরে সর্ব প্রথম এ মসজিদের দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে এর মিমাংসা দিবেন এবং তার এই হুকুম বা মিমাংসা কে খোদায়ী মিমাংসা মনে করে সকলেই মেনে নিবে। খোদার

পার্শ টিকা ঃ ১। ইহার পূর্বে শীস (আঃ) বায়তুল্লাহ মেরামাত করেছিলেন অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহা মেরামত করেন।

মহিমায় সর্ব প্রথম মহানবী (সাঃ) সেই দরওয়াজা দিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করলেন।

তাকে দেখেই এক বাক্যে সবাই বলে উঠল "ইনি আমাদের আল-আমীন"। আমরা তার ফয়সালা মেনে নিতে রাযী আছি। মহানবী (সাঃ) তাশ্‌রীফ আনলেন এবং এমন অভিজ্ঞতা পূর্ণ ফয়সালা করলেন যে, সকলেই খুশী হয়ে গেল।

অর্থাৎ তিনি একটি চাদর নিজ হাতে বিছিয়ে তাতে হাজরে আস্‌ওয়াদ (কালপাথরটি) রেখে দিলেন এবং হুকুম দিলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের মনোনীত ব্যক্তিরা যেন চাদরের এক এক কোন ধরে নেয়। এভাবে তাই করা হল। চাদর হাতে পাথরখানা যথাস্থানে রেখে দিলেন। ইবনে হিশাম এই ঘটনাটি বর্ণনা করবার পর লিখেছেন যে, নবুওয়তের পূর্বে সমস্ত কুরাইশগণ তাকে 'আল-আমীন' বা 'অতি বিশ্বাসী' বরে অভিহিত করত।

(সীরাতে ইবনে হিসাম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৫)

মহানবী (সাঃ) এর নবুওয়ত প্রাপ্তি

মুহাম্মদ (সাঃ) এর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর একদিন পূর্ণ হল তখন বাহ্যিক(১) ভাবে নিয়ম মত তাকে নবুওয়তের মর্যাদায় মনোনীত ও সম্মানীত করলেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির তারিখ ও জন্ম তারিখেরই অনুরূপ রবিউল আওয়াল মাসের সোমবার। -(সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১৪)

দুনিয়াতে ইসলাম প্রচা
তাবলীগের প্রথম পর্যায়

প্রথমত(২) মহানবী (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিল হয়, তখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আদিষ্ট ছিলেন না। বরং তাকে শুধু তার ব্যক্তিগত হুকুম-আহ্‌কাম ছিল।

অতঃপর কিছুদিন ওহী অবতরণ বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় পর্যয়ে যখন ওহী অবতরণ শুরু হল, তখন তাতে মহানবী (সাঃ) কে তাবলীগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু পৃথিবীতে ছিল তখন অজ্ঞতা ও পথ-ভ্রষ্ঠতার ছড়াছাড়ি। বিশেষ করে আরবদের অহংকার ও গর্ব এবং পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ তাদের সত্যের আহ্‌বানে কর্ণপাত করার সুযোগ কখনও দিতনা।

পার্শ টিকা ঃ ১। কেননা, বাতেনী ভাবে তো মহানবী (সাঃ) কে সমস্ত নবীগণের পূর্বেই নবুয়ত প্রদান করা হয়েছিল। (খাসাইসে কুব্‌বা)

২। এই অংশটুকু دروس السيرة المحمديه গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহিত।

এই জন্য প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হেকমতের ইচ্ছা ছিল যে, মহানবী (সাঃ) কে প্রকাশ্যে তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের নিদের্শ না দেওয়া যাতে শুরু থেকেই মানুষ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ না হয়ে পড়ে। সুতরাং মহানবী (সাঃ) প্রথমত তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, এবং যাদের প্রতি তার আস্থা ছিল অথবা নিজের দূরদর্শিতার দ্বারা যাদের মধ্যে পূণ্য ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখতেন তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগলেন। এই দাওয়াতী পন্থায় সর্ব প্রথম তার পবিত্রতমা স্ত্রী হযতর খাদীজা (রাঃ-আন্হা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), চাচাত ভাই হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু (আল্লাহ যাঁর চেহারা সম্মনিত করিয়াছেন) এবং আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক নবুওয়ত পাওয়ার পূর্ব থেকেই মহানবী (সাঃ) এর বন্ধু ছিলেন। এবং তার সত্যবাদীতা বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্র সম্পর্কে খুব অবগত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) যখন তাকে খোদায়ী রেসালাতের সুসংবাদ দিলেন সত্বর তখন তিনি তার সত্যতা মেনেনিয়ে নিলেন। এবং কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তার গোত্রের মান্যগণ্য বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। যাবতীয় কাজ কর্মে লোকেরা তার উপর নির্ভরশীল ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনিও ঐসব লোকদের কে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন, যাদের মধ্যে পূণ্য ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখতে পেতেন। সুতরাং হযরত উসমান গনি (রাঃ), হযরত আঃ রহমান ইবনে আওফ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ), হযরত তাল্‌হা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী তার দাওয়াত গ্রহণ করলেন। তিনি তাদেরকে মহানবীর (সাঃ) এর খেদমতে নিয়ে গেলেন এবং সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের পর হযরত আবু ওবায়দা জাররাহ্ (রাঃ), ওবায়দুল্লাহ ইবনে হারেস (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ আদভী (রাঃ), হযরত আবু সাল্‌মা (রাঃ), হযরত খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ), হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) এবং তার দুই ভাই কুদামাহ্ (রাঃ) ও ওবায়দুল্লাহ, হযরত আরকাম ইবনে আরকাম (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা সবাই কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। অকুরাইশদের মধ্যে হযরত হযরত সুহাইব রুমী (রাঃ) হযরত আম্‌মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত ইসলাম শুধু অপ্রকাশ্য জারী ছিল। ইবাদত-বন্দেগী ও শরীয়তের আচার অনুষ্ঠানও গোপনেই আদায় করা হত। এমন কি পিতা পুত্র থেকে লুকিয়ে নামায আদায় করতেন। মুসলমানদের সংখ্যা যখন ত্রিশের উপর হল, তখন

মহানবী (সাঃ) তাদের জন্য একখানা প্রশস্থ ঘর নির্ধারণ করে দিলেন। তারা সবাই সেখানে একত্রিত হতেন। এবং মহানবী (সাঃ) তাদেরকে ইসলামের তালীম দিতেন।

এই পদ্ধতিতে ইসলামের এক বিশেষ জামাত ইসলামে দীক্ষিত হয়ে পড়ে। এবং তার পর অন্যান্য লোকও ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এই সংবাদ মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে তা আলোচনা হতে থাকে। এভাবে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার সময় এসে যায়।

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতঃ

তিন বৎসর পর যখন বিপুল সংখ্যায় নারী ও পুরুষ ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলেন এবং মানুষের মধ্যে বিষয়টি আলোচনা হতে থাকে, তখন আল্লাহ্ ত'আলা মহানবী (সাঃ) কে নির্দেশ দিলেন যে, (১) প্রকাশ্যে মানুষের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছে দিন।

মহানবী (সাঃ) সত্বর নির্দেশ পালন করলেন এবং মক্কার সাফা পর্বতে আরোহন করে কুরাইশ গোত্র সমূহের নাম ধরে আহ্বান করতে লাগলেন। যখন কুরাইশের সমস্ত গোত্র একত্রিত হল, তখন তিনি প্রথমত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "আমি যদি তোমাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করি যে, শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর লুট তরাজ করবে, তাহলে তোমরা কি আমার সত্যতা স্বীকার করবে? তা শুনে সকলে এক বাক্যে বলল যে, "নিশ্চয়ই আমরা আপনার সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করব। কারণ, আমরা আজ পর্যন্তও আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনাই। অতঃপর মহানবী (সাঃ) বললেন "আমি তোমাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করছি যে, তোমরা যদি তোমাদের বাতিল ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ না কর তা হলে আল্লাহ্ তা'আলার শক্ত আযাব তোমাদের উপর এসে যাবে। কোন মানুষ তার নিজের কওমের জন্য আমার আনীত উপহার থেকে উত্তম কোন উপহার আনে নাই। আমি তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের কল্যাণ ও পরিত্রাণ বহন করে এনেছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন যে, আমি যেন তোমাদিগকে এই কল্যাণ ও পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করি। আল্লাহর, কসম, আমি যদি সারা দুনিয়ার মানুষের নিকট মিথ্যা বলতাম, তবুও তোমাদের নিকট মিথ্যা বলতাম না। আর সারা দুনিয়াকে ধোঁকা দিতাম, তবুও তোমাদিগকে ধোঁকা দিতাম না।

পার্শ টিকা ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين এর মর্মার্থ ইহাই।

সেই মহান পবিত্র সত্বার কসম। যিনি একক এবং যার কোন শরীক নাই আমি তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সারা বিশ্ববাসীর প্রতি সাধারণ ভাবে আল্লাহর রাসূল ও পয়গাম্বর হিসাবে আগমন করেছি।" (দারুস সীরাত, পৃষ্ঠা ১০)

সারা আরবের বিরোধিতা ও শত্রুতা এবং মহানবী (সাঃ) এর দৃঢ়তা

এ দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা এমনি ভাবে অব্যাহত ছিল। আরবরা যখন জানতে পারল যে, মহানবী (সাঃ) এর ওহীতে তাদের মূর্তিগুলির রহস্য উদঘাটন করে দেওয়া হয়েছে এবং মুর্তিপুজারীদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শত্রুতা শুরু করে দিল। তাদের একটি দল তার চাচা আবু তালেবের নিকট এসে বলল যে, তিনি যেন তাকে এধরনের কথা বলা হতে বিরত রাখেন এবং তার সাহায্য ও সহযোগিতা ছেড়ে দেন।

আবু তালেব সু-কৌশলে তাদেরকে জবাব দিয়ে দিলেন। মহানবী (সাঃ) এভাবে সত্যের কালেমা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত প্রসার করে যেতে লাগলেন এবং মূর্তিপূজা হতে মানুষকে বাধা দিতে থাকলেন। আরবরা যখন অধৈর্য্য হয়ে পড়ল, তখন আবার আবু তালেব নিকট এল এবং অত্যন্ত কঠোরতার সাথে তার নিকট দাবী জানাল যে, "আপনি হয়ত আপনার ভাতিজাকে বিরত রাখুন নতুবা আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। যতক্ষণ না দুই দলের ধ্বংস হয়ে যাবে।"

সারা আরবের গোত্রগুলির বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর জবাব

এবার আবু তালিবও চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করলেন। মহানবী (সাঃ) বললেন, "হে সম্মানিত চাচা, আল্লাহর কসম! আরবের মূর্তিপূজারীরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রকে রেখে দেয় এবং চায় যে, আমি আল্লাহর কালিমা তার মাখ্লুকের নিকট পৌছানো থেকে বিরত থাকি। তথাপি কখনো আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত না। যতক্ষন না আল্লাহর সত্য দ্বীন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে অথবা আমি এই সংগ্রামে নিজের জীবন দিয়ে দিব।"

আবু তালেব যখন মহানবী (সাঃ) এর এই অবস্থা দেখলেন, তখন বললেন "আচ্ছা যাও, তুমি নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাক আমিও তোমার সাহায্য সহযোগিতা থেকে কোন সময় বিরত হব না।"

জনমনে ঘৃণা ছড়ানো এবং তার বিপরীত ফল

কুরাইশরা যখন দেখতে পেলেন যে, বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিব তার সাথে রয়েছে এবং এদিকে হজ্জের মৌসুমও ঘনিয়ে আসছে। এই সুযোগে মহানবী (সাঃ) উৎসাহ-উদ্দপনার সাথে প্রচেষ্টা চালান। তার সত্য ভাষনের চুম্বক আকর্ষনের কথা সকলেই অবগত ছিল। তাই তাদের আশংকা দেখা দিল যে, এবার মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বীন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। অতএব তারা সকলে একত্রিত হযে পরামর্শ করল যে, মক্কার সমস্ত রাস্তায় নিজস্ব লোক বসিয়ে দিতে হবে যাতে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হতে যে সব লোক হজ্জ করবার উপলক্ষে আসবে দূরে থাকতেই তাদিগকে সতর্ক করে দেওয়া যায় যে, এখানে একজন যাদুকর আছে, যে তার কথার দ্বারা পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পরস্পরে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়; তোমরা তার নিকট যেয়োনা। কিন্তু–

جراغی راکه ایزدبرفروزد –

کسی کش تف زند ریش بسوزد

"খোদার আদেশ পেলেই যখন যে বাতিটি জ্বলে,
নেভাতে চায় সে বাতিটি পুড়বে দাঁড়ি ফলে।"

আল্লাহর কুদরতে তাদের এ কর্মপন্থা মহানবী (সাঃ) এর দাওয়াত ও তাবলীগের পক্ষেই কাজ করল। যদি তারা এমন করত তা হলে সম্ভবত এমনও হতে পারত যে, বহু লোক হয়তো তাঁর কোন আলোচনাই শুনত না। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা সকলকে তার প্রতি উৎসাহিত করে তুলল।

কুরাইশদের অত্যাচার ও তাঁর দৃঢ়তা

কুরাইশরা যখন তাদের সকল চেষ্টায় বিফল মনোরথ হল এবং দেখল যে, দিন দিন মহানবী (সাঃ) এর দাওয়াতের কাজ ব্যাপক হয়ে পড়ছে ও বিপুল সংখ্যায় লোকজন ইসলামে প্রবেশ করছে তখন তারা তাঁকে নানাভাবে অত্যাচার করতে শুরু করল। মক্কার কতক অসৎ লোককে একত্রিত করে মহানবী (সাঃ) এর প্রত্যেক মজলিসে ঠাট্রা-বিদ্রুপ করার জন্য প্রস্তুত করল এবং যে কোন পন্থায় তাকে কষ্ট দিতে উদ্ধুদ্ধ করল।

মহানবী (সাঃ) কে হত্যার পরিকল্পনা এবং তাঁর প্রকাশ্য মো'জেযা

একবার নবী (সাঃ) কা'বা শরীফের সন্নিকটে নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন, তখন আবু জাহেল এই সুযোগকে গনিমত মনে করে পাথর দ্বারা তাঁর মাথা মোবারক ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে ইচ্ছা করল। কিন্তু

دشمن اگر قویست
نگهبان قوی ترست

অর্থাৎ শক্তিশালী শক্র দেখে ভয় লেগেছে তাই
আল্লাহ্ কিন্তু আরও বেশী শক্তি রাখেন ভাই।

আবু জাহেল যখন পাথর লইয়া মহানবী (সাঃ) এর নিকটবর্তী হল, তখন তাহার হাত কাপতে ছিল, পাথর হাত হতে পড়ে গেল, চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং সে দৌড়িয়ে তার নিজদলে ফিরে গিয়ে বলতে লাগল, "আমি যখন মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাথা মোবারকের প্রতি হাত বাড়ালাম, তখন একটি আশ্চর্য চেহারার উট মুখ হা-করে আমার দিকে ধাবিত হল এবং আমাকে গিলে খেতে উদ্যত হল। আমি এ ধরনের উট আজ পর্যন্তও দেখিনাই। ইহা ছিল সে ঘটনা স্বয়ং কাফের সর্দার আবু জাহেল স্বীকার করে। আবু জাহেল, ওক্বা ইবনে আবি মুয়ীত, আবু লাহাব, আস ইবনে আঃ মুত্তালিব, অলিদ ইবনে মুগীরা, মারার উদ্দেশ্যে তাঁর পেছনে লেগে থাকত। এদের কারও ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক হয় নাই; বরং এদের সব কজনই অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। কেহ বদরের যুদ্ধে তরবারীর আঘাতে এবং কেহ নেহাৎ বিশ্রী ও কঠিন গোগে আক্রান্ত হয়ে পচে গলে মৃত্যু বরণ করে।

কুরাইশ কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে প্রলোভন এবং তার জবাব

কুরাইশরা যখন দেখল যে, তাদের কোন কৌশলই কার্যকরী হচ্ছে না, তখন তারা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত করল যে, তারা তাদের সবচেয়ে চালাক সর্দার উতবা ইবনে রবীয়াকে মহানবী (সাঃ) এর নিকট প্রেরণ করবে। সে তাকে প্রত্যেক প্রকারের দুনিয়াবী প্রলোভন দেখিয়ে বশ করতে চেষ্টা করবে। সম্ভবতঃ এই তদ্‌বীরের কারণে তিনি দ্বীন প্রচারের বিরত থাকবেন।

উত্‌বা ইবনে রবীয়া মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে যখন হাজির হল, তখন তিনি মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। সে নিকটে গিয়ে বলল "ভাতিজা! তুমি বংশগত দিক দিয়ে আমাদের সবার চেয়ে উত্তম। এতদ্‌সত্বেও তুমি নিজের গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করে দিচ্ছ। তাদের পূর্ব পুরুষদের কে মূর্খ প্রতিপন্ন করছ। তোমার এই সব কাহিনীর উদ্দেশ্য যদি অধিক অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করা হয়ে থাকে, তাহলে শোন! আমরা তোমার জন্য এত অধিক অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে দিতে প্রস্তুত যে, তুমি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি তোমার বাসনা এ হয় যে, তুমি একজন সরদার হবে। তাহলে আমরা তোমাকে সারা কোরইশ গোত্রের সরদার বানিয়ে দিব। তোমার আদেশ ছাড়া একটি কনাও আমরা নড়াবনা। এবং তোমার উদ্দেশ্যে যদি বাদশাহী লাভ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ ও

বানাতে পারি। আর যদি তোমার উপর (নাউযুবিল্লাহ) জ্বীনের কোন প্রভাব থাকে এবং যে সব কথা মানুষকে পড়ে শুনাচ্ছ তা তারই কথা হয়ে থাকে, অথচ তুমি তার হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করতে অক্ষম হয়ে পড়ছ। তা হলে আমরা তোমার জন্য একজন চিকিৎসক তালাশ করব যে তোমাকে সুস্থ করে তুলবে।" (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২০)

যখন উত্‌বা তার বক্তব্য শেষ করল, তখন মহানবী (সাঃ) তার সমস্ত আবেদনের জবাবে শুধু কোরআনের একটি সূরা তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। যা শুনে উত্‌বা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং নিজ গোত্রের কাছে ফিরে এসে বলল "খোদার কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনেছি এর পূর্বে জীবনে কখনও তা শুনি নাই। খোদার কসম! ইহা কোন কবিতা ও নয়, গল্পের কোন কথাও নয় এবং যাদু মন্ত্রও নয়। আমার রায় হল এই যে, তোমরা সকলে এই লোক টিকে (মুহাম্মদ সাঃ) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা আমি তার যে কালাম শ্রবণ করেছি, আল্লাহর কসম! এর সুমহান মর্যাদা প্রকাশিত হবে। আমি তোমাদের ভাল চাই। তোমরা আমার কথা শুন এবং বেশী একটা মানতে না চাও তাহলে কিছু দিন অপেক্ষা কর। যদি আরবগণ বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে তোমরা বিনা পরিশ্রমেই এই বিপদের হাত হতে নাজাত পেয়ে যাবে। আর যদি সে আরবগণের উপর বিজয়ী হয় তাহলে তার সম্মান আমাদের সম্মান। কেননা সে আমাদের গোত্রেরই লোক।"

কুরাইশরা তাদের সবচেয়ে সতর্কবান সরদারের কথাগুলি শুনে অবাক হয়ে গেল এবং এই বলে জান বাঁচাল যে, তার উপর মুহাম্মদ (সাঃ) যাদু করেছে। (দুরুসুস্ সীরাত পৃষ্ঠা ১৪)

যখন কুরাইশদের কোন চালবাজই কাজে এলোনা তখন মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাথে তার সাহাবীগণ এবং ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনের প্রতিও নির্যাতন ও নানাহ্ কষ্ট দেওয়া শুরু করল। হযরত বিলাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণকে শক্ত কষ্ট দেওয়া হল। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির এর সম্মনিতা মাতাকে একারণেই অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করা হল। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই সর্ব প্রথম শাহাদতের ঘটনা। (মোগলতাঈ দ্রঃ)

সাহাবাদের কে হাবশায় হিযরতের হুকুম

মহানবী (সাঃ) নিজে সর্ব প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করছিলেন। কিন্তু যখন সাহাবায়ে কেরামও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত উক্ত ঘটনা পৌঁছল এবং দেখতে পেলেন যে, তারা অত্যন্ত সবরের সাথে সব অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু সেই সত্যের বাণী ও আল্লাহর নূর থেকে মুখ ফিরাবার জন্য কখনও রাযী নন যা তারা মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত

হয়েছেন, তখন তিনি সেই সাহাবায়ে কেরামকে হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরত করার জন্য অনুমতি প্রদান করলেন।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পঞ্চম(১) বৎসরের রজব মাসে বারজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা হাবশার দিকে হিজরত করেন। যাদের মধ্যে হযরত উসমান (রাঃ) এবং তার স্ত্রী রুকাইয়াও ছিলেন। (দারুসুস সীরাত পৃষ্ঠা ১৫ দ্রঃ)

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী(২) এই মুহাজেরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তারা সেখানে শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন। কুরাইশরা যখন তাদের খবর পেল, তখন আমর ইবনে আস, আবদুল্লাহ ইবনে রবীয়াকে নাজ্জাশীর নিকট এই বলে পাঠালেন যে, এ লোকগুলি ফাসাদ সৃষ্টিকারী। তাদেরকে আপনার রাজ্যে স্থান দিবেন না বরং তাদেরকে আমাদের নিকট অর্পণ করুণ।

নাজ্জাশী একজন বিচক্ষন লোক ছিলেন। তিনি তাদের জবাবে বললেন "আমি এই কাজ ততক্ষন পর্যন্ত করতে পারবনা যতক্ষন পর্যন্ত তাদের মতাদর্শ ও উদ্দেশ্য তদন্ত না করব।" অতপরঃ তিনি মোহাজেরগণকে বললেন, তোমরা তোমাদের মতাদর্শ ও তার সঠিক ঘটনাসমূহ বর্ণনা কর। তখন জাফর(৩) ইবনে আবি তালিব (রাঃ) অগ্রসর হয়ে বললেন " হে রাজন্য! আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তিদের পূজা করতাম এবং মৃত জানোয়ার ভক্ষণ করতাম; ব্যভিচার, আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা, ও দুশ্চরিত্রতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের গ্রাস করে ফেলত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠালেন, যিনি আমাদেরই একজন পুত্র সন্তান। আমরা তার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্তা ও পবিত্রতা সম্পর্কে ভালভাবেই জানি। তিনি আমাদের এই আহ্বান জানালেন যে, আমরা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করি, তার সাথে কাউকে অংশীদার না করি, মূর্তিপূজা ত্যাগ করি, সত্য কথা বলি, আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখি, প্রতিবেশীদের সাথে সৎব্যবহার করি। তিনি আমাদের মুহার্‌রামাত (যাদের সহিত বিবাহ সাদী নিষিদ্ধ) মহিলাগণের সাথে

পার্শ টিকা ঃ ১। সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ২১। মুহাজেরগণের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে।

২। হাবশাহ্‌র বাদশাহগণকে নাজ্জাশী বলা হত (মোগলতাঈ)

৩। ইউরোপের কোন কোন রাজনীতিবিদ (সম্ভবত লর্ড ক্রোমার) বলেছেন। "যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্রের সমস্ত আলেম একত্রিত হয়ে দ্বীন ইসলামের হেকমত বর্ণনা করতে চান তা হলে হাবশার মুহাজেরগণ যেমনটি বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে উত্তম বর্ণনা প্রদান করতে সক্ষম হবেনা। (দুরুসুত্বারিখ)

বিবাহ সাদী নিষেধ করলেন। খুন খারাবী, মিথ্যবলা, এতীমের সম্পদ ভক্ষণে নিষেধ করলেন এবং আমাদের নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জের নির্দেশ দেন। আমরা এসব কথা শুনে তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করলাম।" নাজ্জাশী(২) এই ভাষণ শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। কুরাইশী দূতগণকে ফিরিয়ে দিলেন এবং নিজে মুসলমান হয়ে গেলেন।

মুহাজিরগণ আনুমানিক তিন মাস সেখানে শান্তি ও নিরাপদে অবস্থান করে অতঃপর মক্কায় ফিরে এলেন। এ সময় হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) ও মহানবী (সাঃ) এর দোয়ার বরকতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশজন পুরুষ ও এগার জন(৩) মহিলা থেকে বেশী ছিলনা। ফারুকে আযম হযরত ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের এক প্রকার শক্তি অর্জন হল এবং ঐ সকল লোক যারা সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে ইসলামের বাস্তবতাকে বিশ্বাস করছিল কিন্তু কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতে পারেনি। এখন তারা প্রকাশ্যে ইসলামের প্রবেশ করতে শুরু করলেন। এমনিভাবে আরবগোত্রসমুহের মধ্যে ইসলাম প্রসারিত ও উন্নতি হতে লাগল।

কুরাইশরা যখন দেখল যে, মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের ইজ্জত ও মর্যাদা দৈনন্দিন বেড়ে চলছে। এমন কি হাবশার বাদশা নাজ্জাশীও তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান করছেন, তখন তারা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে ভাবতে লাগল।

সমস্ত কোরইশরা এই ফয়সালা করল যে, বনি আবদুল মুত্তালিব ও বনি হাশেমের নিকট দাবী দাওয়া পেশ করা হউক এ মর্মে যে, তারা তাদের ভাতিজা মুহাম্মদ (সাঃ) কে আমাদের নিকট অর্পণ করুক নতুবা আমরা তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করব।

কিন্তু বনি আব্দুল মুত্তালিব এই দাবী-দাওয়া মঞ্জুর করল না। তখন কুরাইশরা সর্বসম্মতি ক্রমে এই অঙ্গীকার(৩) নামা লিখল যে, বনি হাশিম ও বনি মুত্তলিব এর সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মোকাবেলা করা হবে। তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা, বিবাহশাদী, ক্রয়-বিক্রয় সবকিছু বন্ধ থাকবে। তারপর এই অঙ্গীকার নামা কা'বা ঘরে টানিয়ে দেয়া হল।

পার্শ্ব টিকা ঃ ১। এই নাজ্জাশী অন্য কোন ব্যক্তি হবেনা। যিনি নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আসহামা নামক নাজ্জাশী যাহার ৬ষ্ঠ হিজরিতে মুসলমান হবার বিবরণ পরে বর্ণিত হতে যাচ্ছে।

২। দুরুসুল তারিখুল ইসলাম পৃঃ ২২।

৩। এই অঙ্গীকার নামা মানুসুর ইবনে ইকরামা লিখেছিল এবং ইহার পরিণতিতে তার হাত অবশ হয়ে গিয়াছিল। (মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৪)

একটি পাহাড়ের উপত্যকায় মহানবী (সাঃ) ও তার সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও নিকটাত্মীয়দেরকে বন্দী করা হল। এই সময় আবু লাহাব ছাড়া বনি হাশেম ও বনি আবদুল মুত্তালিবের সকল লোক মুসলিম অমুসলিম দলমত নির্বিশেষে আবু তালিবের সাথে ছিল এবং এই উপত্যকায় বন্দী ও অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করেন। সর্ব দিক থেকে আমদানী ও রফতানীর রাস্তা বন্ধ ছিল। পানাহারের যেসব সামান ছিল, নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন কঠিন দুর্ভাবনা শুরু হল। অতি ক্ষুধার কারণে গাছের পাতা পর্যন্ত খাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হলো।

এ অবস্থা দেখে মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবাগণকে দ্বিতীয়বার হাবশার দিকে হিজরত কররা নির্দেশ দেন। এইবার এক বিশাল কাফেলা হিজরত করলেন, যাঁদের সংখ্যা ছিল তিরাশি জন পুরুষ এবং বারজন মহিলা(১)। অতপর এঁদের সাথে ইয়ামেনের মুসলমানগণসহ হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাঃ) ও তার গোত্রের লোকজন যোগ দিয়েছিলেন।

এদিকে মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরাম সুদীর্ঘ তিন(২) বৎসর জুলুম অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করেন।

এরপর কিছুলোক এই অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে এবং মহানবীর (সাঃ) উপর হতে এই অবরোধ তুলে নিতে উদ্যেগী হলেন। ঐ দিকে মহানবী (সাঃ) কে ওহী মারফতে জানানো হল যে, এই অঙ্গীকার নামাকে পোকায় খেয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত এর কোন হরকতই আর অক্ষত নাই। মহানবী (সাঃ) তা লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন। তখন অঙ্গীকার নামাটি এমন অবস্থায় বাহির করে দেয়া হল যেমন ভাবে তিনি বলেছিলেন। সর্বশেষে নবী (সাঃ) এর উপর থেকে অবরোধ তুলে নেয়া হল।

তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ

এই সময়ে (যিনি অত্যন্ত শরীফ ও আপন গোত্রের নেতা ছিলেন) মহানবী (সাঃ) এর খুঁজতে হাযির হলেন এবং ইসলামের প্রকাশ্য সত্যতার নির্দশন আর মহানবী (সাঃ) এর চরিত মাধুর্য দেখে স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করলেন। তারপর আরয কলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোত্রের লোকেরা আমার কথা মান্য করে। আমি বাড়িতে ফিরে তাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দেব কিন্তু আল্লাহর নিকট আপনি এমন কোন প্রকাশ্য নিদর্শনের জন্য দোআ করুন

১। সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা-২৪।

২। কোন কোন রেওয়াতে দুই বৎসর আর কোন রেওয়ায়েতে কয়েক বৎসরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

যাদ্বারা আমি তাদেরকে আমার কথা স্বপক্ষে বিশ্বাস করাতে পারি। মহানবী (সাঃ) দোআ করলেন, আল্লাহ তা'আলা এজন্যে তার কপালে এমন এক নূর চমকিয়ে দিলেন যা অন্ধকারে উজ্জল আলোর মত জ্বল জ্বল করত। তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (রাঃ) যখন তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে গেলেন, তখন তার খেয়াল হল যে, তার গোত্রের লোকেরা পাছে হয়তো একে একটি বিপদ বা রোগ মনে না করে বসে যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার মধ্যে এই রোগ চেপে বসেছে, এজন্য দো'আ করলেন যে, এই নূরটি যেন তার চিবুকে চলে আসে।

আল্লাহ তা'য়ালা তার দো'আ কবুল করলেন এবং কপালের নূরটিকে চিবুকের মধ্যে ঝুলন্ত ঝাড়বাতির মত করে দিলেন। অতঃপর তিনি আপন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলমান হলেন বটে কিন্তু তার ধারণা মোতাবেক যথেষ্ট হয়নি। এজন্য তিনি মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর প্রচেষ্টা সফলকাম হবার জন্য দো'আর আবেদন কররেন। মহানবী (সাঃ) দো'আ করলেন এবং বললেন, "যাও প্রচার কর এবং নম্রতা বজায় রেখ।" তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (রাঃ) ফিরে গেলেন এবং ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে লাগলেন। খোদার ফজলে এবার এমন সফলকাম হলেন যে, খন্দকের যুদ্ধের পরে ৭০/৮০টি পরিবারকে মুসলমান বানিয়ে খায়বারের যুদ্ধের সময় নিজের সাথে করে নিয়ে এলেন এবং সবাই জেহাদে অংশ গ্রহণ করলেন। (মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৫)

আবু তালেবের মৃত্যু

এ সময়ে মহানবী (সাঃ) এর চাচা আবু তালেবের ইন্তিকাল(১) হয়। এই হৃদয় বিদারক ঘটনা নবুওয়াতের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সংঘটিত হয়েছিল। এর তিন দিন(২) পর হযতর খাদীজাও ইন্তিকাল করেন। এই কারণে মহানবী (সাঃ) এই বৎসরকে শোকের বৎসর(৩) বলেছেন।

(সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৩০)

মহানবী (সাঃ) এর তায়েফ গমন

আবু তালেবের ইন্তিকালের পর কুরাইশরা মহানবী (সাঃ) এর উপর নির্যাতনের সুযোগ পেয়ে গেল। তাকে নির্যাতনের কোন পন্থাই তারা বাকী

পার্শ্ব টিকা ঃ ১। সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ২৫।

২। ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ৫ই রমজান, হিজরতের ৫ বৎসর পূর্বে, হিজরতের ৪ বৎসর পূর্বে, মে'রাজের পরে ইত্যাদি। (মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ২৬)

৩। এই বৎসরই হযরত সাওদা (রাঃ) এর সাথে হুজুর (সাঃ) এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মতান্তরে হযরত আয়শার (রাঃ) পরে তার সাথে বিবাহ হয়েছিল।

রাখেনি। যখন মক্কাবাসীগণের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হতে লাগল, তখন মহানবী (সাঃ) এই বৎসরেই অর্থাৎ নবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ গমন করলেন এবং তায়েফ বাসীকে সত্য কালেমার প্রতি আহ্বান করলেন। একমাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে তাদেরকে তাবলীগ ও হেদায়াতের কথা জানালেন।

কিন্তু একটি লোকেরও সত্য গ্রহণের তাওফিক হল না; বরং যালেমরা মহানবী (সাঃ) কে নানাভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য আপন শহরের লোকগুলোকে লেলিয়ে দিল। এই নিষ্ঠুর হতভাগারা সওয়ারে কায়েনাতের পিছনে লেগে গেল। রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীনের শান যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে তার পবিত্র ঠোঁটের নড়াচড়ায় তাদের সকল পাগলামীর পরিসমাপ্তি ঘটে যেতে পারত এবং তায়েফ ও তায়েফবাসীর নাম নিশানা পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে মিটিয়ে দেয়া হত। শুরু করল, যার ফলে তার পা মোবারক রক্তেরঞ্জিত হয়ে গেল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যে দিকে থেকে পাথর আসতে দেখতেন সেদিকে নিজে দাড়িয়ে মহানবী (সাঃ) কে বাঁচাতেন এবং নিক্ষিপ্তপাথর নিজের মাথা পেতে নিতেন। এমনকি হযরত যায়েদের মাথা যখম হয়ে গেল। পরিশেষে রহ্‌মতে এই হতভাগ্য দুরাচারিরা মহানবী (সাঃ) এর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে আলম (সাঃ) একমাস পরে তায়েফ থেকে এমন অবস্থায় ফিরলেন যে, তাঁর টাখনু ছিল রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর জবান মোবারক থেকে কোন বদ দো'আ আসেনি।

মহানবী (সাঃ) এর ইস্‌রা ও মে'রাজ

নবুওয়াতের একাদশ(১) বৎসরটি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদা রাখে। যাতে ফখরুল আম্বিয়া (সাঃ) কে সম্মানজনক শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান যাহা সমস্ত নবীগণের জমাদততের মধ্যে শুধু মহানবী (সাঃ) এর পৃথক বৈশিষ্ট্য ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

একরাতে মহানবী (সাঃ) হাতীমে(২) কা'বায় শায়িত ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবারাইল হযরত মিকাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং বলিলেন– "আমার সাথে চলুন।" তাকে বোরাকে সওয়ার করানো হল। যার দ্রুত গতি এত ছিল যে, যেখানে তার দৃষ্টি পড়ত, সেখানেই তার কদম পড়ত। এমনি তড়িৎ গতিতে মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রথমতঃ সিরিয়ায় (শাম) আল-আকসা

পার্শ্ব টিকা ঃ ১। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে ইমাম যহরীর বরাতে এমনি বলা হয়েছে। (নশরুত্বী)

২। যেমনটি বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে। বোখারীর কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নবীজি (সাঃ) স্বীয় বাসভবনে শায়িত ছিলেন।

মসজিদে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আল্লাহ তাআলা সমস্ত পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম কে মহানবী (সাঃ) এর সম্মানার্থে (মো'জেযা স্বরূপ) একত্রিত করে রেখেছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) সেখানে পৌঁছে আযান দিলেন এবং সমস্ত নবী ও রাসূলগণ নামাযের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন।

কিন্তু নামাযের ইমামতি কে করবেন এমর্মে সকলেই অপেক্ষা করছিলেন। জিব্রাঈল আমীন নবীজির হস্ত মোবারক ধরে তাঁকে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি সমস্ত নবী-রাসূল ও ফেরেস্তাগণকে নামায পড়ালেন।

এই পর্যন্ত পার্থিব জগতের সফর ছিল, যা বোরাকের মাধ্যমে হয়েছিল। তারপর ধারাবাহিকভাবে আকাশ সমূহের সফল(১) করানো হল। প্রথম আকাশে হযরত আদম (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা ও ইয়াহইয়া (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। তৃতীয় আকাশে

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। (ফতহুল বারী ১৫ পারা, পৃষ্ঠা ৪৮৫)

এরপর মহানবী (সাঃ) সিদরাতুল মুনতাহার দিকে তাশরীফ নিয়ে যেতে লাগিলেন। রাস্তায় হাউযে কাওছার অতিক্রম করলেন। অতপর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন।

সেখানে আল্লাহর কুদরতী হাতের ঐসব বিস্ময়কর জিনিষ ও অপূর্ব সৃষ্টি সমূহ দর্শন করলেন, যা আজও কেউ দর্শন করেনি কোন কানও তা শুনেনি এবং কোন মানুষের চিন্তাধারাও সেখান পর্যন্ত পৌঁছেনি। অতঃপর দোযখকে তার সামনে হাযির করা হল। যাহা সর্ব প্রকারের আযাব ও ভীষণ অগ্নি দ্বারা ভরপুর ছিল। যার সামনে লৌহ ও পাথরের মত শক্ত কঠিন জিনিষেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাতে মহানবী (সাঃ) একদল মানুষকে দেখলেন, তারা মৃত জানোয়ার ভক্ষন করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন "তারা হল ঐসব লোক যারা মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষন করত (অর্থাৎ গীবত করে ফিরত)"। এরপর দোযখের দরওয়াযা বন্ধ করে দেয়া হল।

তারপর মহানবী (সাঃ) সামনে অগ্রসর হলেন আর জিব্রাঈল (আঃ) এখানেই রয়ে গেলেন। কেননা তার এর চেয়ে বেশী যাওয়ার অনুমতি ছিলনা।

১। এই সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, এই আসমানী সফর বোরাকের মাধ্যমে হয়েছিল, না অন্য কোন আসনের মাধ্যমে। হাফেজ নাজমুদ্দীন গায়তী "কিস্‌সাতুল মে'রাজে" এই সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

সে সময় তাঁর মহান আল্লাহ পাকের যিয়ারত নসীব হল। বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, যিয়ারত শুধু অন্তরের দ্বারাই নয় বরং চর্ম চোখেও হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সমস্ত সুক্ষদর্শী সাহাবা ও ইমাম গণের তাই অভিমত।

মহানবী (সাঃ) সেজদায় পড়ে গেলেন এবং আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সৌভাগ্য অর্জিত হল। সেই সময়ই নামায সমূহ ফরজ করা হয়। এর পর সেখানে থেকে তিনি ফিরে এলেন। পুনরায় বোরাকে চড়ে মক্কা শরীফের দিকে চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি ব্যবসায়ী কাফেলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যাদের মধ্য থেকে কোন কোন লোককে তিনি সালামও করেন। তারা উনার কন্ঠস্বর বুঝতে পারলেন এবং মক্কায় ফিরে আসবার পর এ ব্যপারে সাক্ষীও দিলেন। ভোর হওয়ার পূর্বেই এই মোবারক সফর সমাপ্ত হয়ে যায়।

মহানবী (সাঃ) এর ইস্‌রা সম্পর্কে অবিকল সাক্ষ্য

ভোরবেলা কুরাইশদের নিকট এই সংবাদ প্রচার হলে তাদের এক অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হল। কেউ হাততালি বাজাতে লাগল, আবার কেউ আশ্চর্য হয়ে মাথায় হাত দিল, কেউ বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল। অতঃপর সবাই পরীক্ষামুলকভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কে প্রশ্ন করতে লাগল, আচ্ছা বলুনতো, বায়তুল মুকাদ্দসের নির্মাণ ও আকৃতি কেমন ও পাহাড় থেকে ইহা কতটুকু দূরে অবস্থিত? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ নক্‌শা বলে দিলেন। এভাবে তারা নানাহ প্রশ্ন করতে লাগল এবং তিনি প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। এমন কি এক সময় তারা এমন প্রশ্ন শুরু করে দিল যে, সব জিনিষ একবার দেখেও কেহ বলতে পারবে না। যেমন মসজিদে আক্‌সার দরজা কয়টি ও সিড়ি কয়টি ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, এই সব কে গুনে রাখে? এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শক্ত দুর্ভাবনায় পড়লেন কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস (মসজিদে আক্‌সা) কে মো'জেযা স্বরূপ তাঁর সামনে উপস্থিত করে দেয়া হল। তিনি এগুলি গুনে, গুনে তাদেরকে বলে দিতে লাগলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলে উঠলেন–

اشهد انك لرسول الله অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি নিশ্চয় আপনি - আল্লাহর রাসূল। "কুরাইশগণ সকলেই চুপ করে রইল এবং বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) মসজিদে আক্‌সার বিবরণ তো ঠিকই দিয়েছেন। অতঃপর তারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলতে লাগল "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এক রাত্রে মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত ভ্রমন করে আবার ফিরে এসেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি এরচেয়ে আরও বেশী আশ্চর্যজনক কথায়ও তাঁকে বিশ্বাস করি। আমি ঈমান

পোষন করি যে, সকাল-সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাঁর কাছে আসমানী সংবাদসমূহ যেখানে পৌঁছে যায়, সেখানে মসজিদে আক্‌সা ভ্রমণে কি সন্দেহ থাকতে পারে? এজন্যই তাঁর সিদ্দিক উপাধী রাখা হয়।

স্বয়ং কুরাইশ কাফিরদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য

অতঃপর পরীক্ষামুলকভাবে কুরাইশরা পুনরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা বলুন, আমাদের অমুক কাফেলা যারা শামের উদ্দেশ্য রওয়ানা করল তারা বর্তমানে কোথায়"? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, অমুক গোত্রের এক ব্যবসায়ী দলকে রওহা নামক স্থানে আমি অতিক্রম করেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা সকলেই এর তালাশে বের হয়েছিল। আমি তাদের হলাওদার নিকট গিয়েছিলাম, সেখানে কেউই ছিলনা। একটি সুরাহিতে পানি রাখা হয়েছিল আমি তা পান করেছিলাম। অতঃপর অমুক গোত্রের ব্যবসায়ী কাফেলাটি আমি অমুক স্থানে অতিক্রম করেছি। বোরাকটি যখন তার নিকট গেল, তখন উটগুলি ভয়ে এদিক সেদিক পালাতে লাগল। তাদের মধ্যে একটি লাল বর্ণের উট ছিল। যার উপর সাদা ও কাল বর্ণের দুটি থলেও ছিল। এটি তো বেহুসই হয়ে যায়। অতঃপর অমুক গোত্রের ব্যবসায়ী কাফেলাটিকে আমি তান্ঈম নামক স্থানে অতিক্রম করেছি। যার মধ্যে সর্ব প্রথম খাকীবর্ণের থলে ছিল। অতিশীঘ্র এই কাফেলা তোমাদের নিকটে এসে পৌঁছবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, "কবে পর্যন্ত এসে পৌঁছবে?" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বুধবার পর্যন্ত এসে পৌঁছবে। "সুতরাং ঠিক এমনিভাবে ঘটনাটি ঘটল মেযনিভাবে তিনি বলেছিলেন। কাফেলাগুলোও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবরণের সত্যতা স্বীকার করিল। যখন কুরাইশদের উপর আল্লাহ তা'লার দলিল প্রমাণাদি পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং এই আর্শ্চযজনক সফরে স্বয়ং তাদের সম্প্রদায়ই সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন বিরোধীদের জন্যও এ ছাড়া অস্বিকারের কোন রাস্তা রইল না, তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফরকে যাদু এবং তাঁকে যাদুকর (নাউযুবিল্লাহ) বলে বৈঠক থেকে উঠে পড়ল।

পবিত্র মদীনায় ইসলাম

দশবৎসর পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলিকে খোলা খুলি ভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের এমন কোন মজলিস ছিলনা। যেখানে গিয়ে তিনি তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দেননি। হজ্জের মৌসুমে উক্কাযের মেলায়, যিল্ মাজায ইত্যাদি স্থানে যেয়ে তিনি মানুষকে সত্যের দিকে দাওয়াত দেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তারা তাঁকে সর্ব প্রকার কষ্ট দিতে ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, "আগে নিজের গোত্রকে মুসলমান করুন। তারপর আমাদেরকে হেদায়েত করতে

আসুন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করলেন ইসলামের প্রসার ও উন্নতি হউক, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আউস গোত্রের কয়েকজন লোক পাঠালেন যাদের মধ্যে আসয়াদ ইবনে যুরারা ও যাক্ওয়ান ইবনে আবদেকায়েস এই দুইজন লোক সে বৎসর মুসলমান হয়ে যান। পরবর্তী বৎসর তাদের মধ্য হতে আরও কিছু লোক আগমন কররেন এবং ছয় অথবা আটজন মুসলমান হলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, "ইসলাম প্রচারে তোমরা কি আমাকে সাহায্য করতে পারো?" তাঁরা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে আমাদের পরস্পরের আউস(১) ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ে গৃহযুদ্ধ চলছে। আপনি এ সময় মদীনায় তাইয়্যেবায় যান তাহলে সকলে আপনার হাতে বাইয়্যেতের ব্যাপারে একমত হবে না। এই এক বৎসর পর্যন্ত আপনি মদীনায় যাবার ইচ্ছা মুলতবী ঘোষনা করুন। সম্ভবতঃ আমাদের পরস্পরে একটা সন্ধি হয়ে যাবে এবং আমরা আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোক এক সাথে মুসলমান হয়ে যাব। আমাগী বৎসর আমরা আবার আপনার খেদমতে হাজির হব। এ সম্পর্কে ফয়সালা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর তারা মদীনায় ফিরে গেলেন। মদীনায় সর্বপ্রথম বনু-যুরায়েকে মসজিদে কুরআন পাঠ করা হল। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল যে, মদীনায় ইসলাম প্রচার হউক। সেই এক বৎসরের মধ্যেই আউসও খায্রাজ গোত্রের ঝগড়া মিটে গেল। আগামী হজ্জের মৌসুমে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১২ জন লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হল। তাদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং ২৫ জন ছিলেন আউস গোত্রের। তাদের মধ্যে গত বৎসর যারা মুসলমান হন নাই তারাও এবার মুসলমান হয়ে গেলেন। এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে সবাই বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

এই বাইয়াত যেহেতু আকাবার(২) নিকট হয়েছিল তাই একে আকাবার প্রথম বাইয়াত নামে অভিহিত করা হয়। (সীরাতে হালবীয়া ১ম খন্ড পৃঃ ৪২)

তারা মুসলমান হয়ে মদীনা তাইয়্যেবায় ফিরে এল। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগল এবং প্রতিটি মজলিসে একথাই আলোচনা হতে লাগল।

পার্শ্ব টিকা ঃ ১। মদীনায় অধিবাসীরা সে সময় দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ১। মুশরেকীন ২। আহলে কিতাব। মুশ্রেকীন্রা দুই গোত্রে বিভক্ত ছিল। ১। আউস ২। খাযরাজ। এই দুই গোত্র সব সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকত এবং প্রায় ১২০ বৎসর যাবৎ তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের যের চলে আসছিল। (সীরাতের হালবীয়া ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০) এমনি ভাবে আহলে কিতাবগণ দুই বাগে বিভক্ত ছিল। ১। বনু-কোরায়যা ২। বনু-নাযীর। এই দুই গোত্র ও নিজেদের মধ্যে পুরাতন শত্রুতা পোষণ করত (বায়যাভী)।

২। জুমরায়ে আকাবা যা মিনার প্রথম অংশে অবস্থিত। হাজীগণ এর উপর কংকর নিক্ষেপ করে থাকেন। পরে এখানে একটি মসজিদ নির্মান করা হয়ে ছিল। তা মসজিদে বাইয়াত নামে পরিচিত ছিল। (সীরাতে হালবীয়া ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২)

পবিত্র মদীনায় সর্ব প্রথম মাদ্রাসা

মদীনায় পৌঁছে আউস ও খাযরাজ গোত্রের দায়িত্বশীলগণ মহানবী (সাঃ) কে পত্র লিখলেন যে, আলহামদু লিল্লাহ। আমাদের এখানে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটেছে। এখন আমাদের এখানে এমন একজন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিন যিনি এসে আমাদেরকে কুরআন শরীফ পড়াবেন। লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। আমাদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবেন এবং নামাযের ইমামতি করবেন। মহানবী (সাঃ) মাসয়াব ইবনে উমায়ের (রাঃ) কে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে ইসলাম সর্ব প্রথম মাদ্রাসা মদীনায়ে তাইয়্যেবায় প্রতিষ্ঠিত। (সীরাতে হালবীয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩)

পরবর্তী বৎসর হজ্জের মৌসুমে মদীনা তাইয়্যেবা থেকে একটি বড় কাফেলা মক্কা শরীফ এসে পৌঁছে। তাদের মধ্যে ৭০ জন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাদের নিকট আকাবার সন্নিকটে মিলিত হবার ওয়াদা দিলেন। ওয়াদা মোতাবেক অর্ধরাতে সবাই একত্রিত হলেন মহানবী (সাঃ) এর সাথে উনার চাচা আব্বাস (রাঃ) ছিলেন। যদিও তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।

যখন সকলেই একত্রিত হন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) সকলকে খেতাব করে বললেন, ইনিই মুহাম্মদ (সাঃ) আমার ভাতিজা। সর্বদা আপন গোত্রে মান সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে আসছে। আপনারা যারা উনাকে মদীনায় নিয়ে যেতে চান তারা ভেবে দেখুন, যদি আপনারা তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করতে পারেন এবং শত্রুর হাত হতে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন, তাহলে এ দায়িত্বে এগিয়ে আসুন। নতুবা তাঁকে আপন গোত্রে বাস করতে দিন।

আগত মদীনার কাফেলা সরদার বলে উঠলেন, "নিশ্চয় আমরা তাঁর যিম্মা নিচ্ছি এবং মহানবী (সাঃ) এর বাইয়াতের বাস্তবায়নই আমাদের একমাত্র কামনা। তা শুনে হযরত আস্‌আদ ইবনে যুরারা বলে উঠলেন, "হে মদীনা বাসীগণ! একটু অপেক্ষা কর। তোমরা কি জান আজ তোমরা কিসের বাইয়াত গ্রহণ করলে? জেনে রাখ, এই বাইয়াত সারা আরব ও অনারবের মোকাবিলা ও বিরোধিতার অঙ্গিকার। তোমরা যদি তা পূর্ণ করতে পার, তাহলে বাইয়াত গ্রহণ কর। নতুবা অপারগতা প্রকাশ কর। একথা শুনে সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলেন, "আমরা কিছুতেই এই বাইয়াত থেকে পিছ পা হব না। অতপর তাঁরা আরজ করলেন, "হে রাসূল! আমরা যদি এই অঙ্গিকার পূরণ করি তাহলে আমাদের কি প্রতিদান মিলবে।" মহানবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত। তা শুনে সকলে বলে উঠলেন "আমরা তাতেই সন্তুষ্ট। আপনি হস্ত

মোবারক বাড়িয়ে দিন। আমরা বাইয়াত গ্রহণ করি। মহানবী (সাঃ) হস্ত মোবারক বাড়িয়ে দিলেন এবং সকল বাইয়াতের গৌরব অর্জন করলেন।

আল্লাহপাকই ভাল জানেন, এই রাসূলে আমীন (সাঃ) এর শুভ দৃষ্টি ও সামান্য কতকগুলি বাক্য তাদের মধ্যে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, মাত্র একটি বারের সঙ্গে লাভে সমস্ত পার্থিব পংকিলতা ও ধনসম্পদের মহব্বত অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে শুধু আল্লাহর মহব্বতের রঙে এই পরিমাণ রঙিণ হয়ে উঠল, যার কারণে নিজেদের জান-মাল এবং ইজ্জত আব্রু সব কিছুই তার মোবাবেলায় বিসর্জন দিতে তারা তৈরী হয়ে গেলেন। এর রঙ্গ তাদের পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এই প্রসঙ্গে উক্ত বাইয়াতে উপস্থিত হযরত উম্মে আম্মারার সাহেবযাদা হযরত যোবাইর (রাঃ) এর ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। নবুওয়তের ভণ্ড দাবীদার মুসাইলামাতুল কায্যাব তাকে বন্দী করেছিল এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করে অত্যন্ত নিষ্টুরতার সাথে তাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এই অঙ্গীকারের বিপক্ষে তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের করাতে পারে নাই। এই পাপিষ্ট মুসায়লামা তাকে জিজ্ঞাসা করত, "তুমি কি একথা সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মহানবী (সাঃ) আল্লাহর রাসূল?" তিনি উত্তরে বলতেন, "নিশ্চয়ই। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করত "তুমি এ সাক্ষ্যও দাও কি যে, আমি মুসায়লামা ও আল্লাহর রাসূল? তিনি জাবাবে বলতেন না। একথার পর সে তার শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলত। অতঃপর এমনিভাবে সে তাকে জিজ্ঞাসা করত আর তিনি তার নবুওয়ত অস্বীকার করতেন। তখন এই পাষান মুসায়লামা তার আরো একটি অঙ্গ কেটে ফেলত। এমনিভাবে এক এক করে সমস্ত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে দেয়। (সীরাতে হাল্বীয়া পৃষ্ঠা ৪০৯)

মোট কথা তিনি শাহদাৎ বরণ করলেন, অথচ শরীয়তে অনুমতি থাকার পর ও অঙ্গীকারের খেলাফ কোন কথা মুখে উচ্চারণ করা তিনি অপছন্দ করলেন। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

اگرچه خرمن عمرم غم تو داد بباد

بخاك پائی عزیزت کی عهد شکستم

"ইহাই জানি ভালবাসি শুধু

মরণ আমার পুরস্কার।

শপথ লাগে তোমার পায়ের

তুলে যাইনিকো অঙ্গীকার।

ইহাই পর সকলে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। বাইয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে সেই সময় ছিলেন ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। তাকে বলা হয় আকাবার

দ্বিতীয় বাইয়াত। অতঃপর মহানবী (সাঃ) তাদের মধ্যে ১২ জন কে পুরা কাফেলার যিম্মাদার বানিয়ে দিলেন।

মদীনায় হিজরতের সূচান

কুরাইশরা যখন উক্ত বাইয়াতের খবর জানতে পারল, তখন তাদের রাগের অন্ত রইল না এবং তারা মুসলমানগণকে অত্যাচার করার কোন পন্থাই বাকী রাখেনি। মহানবী (সাঃ) তখন সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। সাহাবীগণ আস্তে আস্তে কুরাইশদের অগোচরে একজন দুইজন করে মদীনায় হিজরত করা শুরু করলেন। এমন কি মক্কায় মহানবী (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং কিছু সংখ্যক অপরাগ লোক ছাড়া অন্য কোন মুসলমানই বাকী রইলেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হিজরতের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাঁকে এই বলে বারণ করলেন; এখন বিরত হও, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে হিজরতের অনুমতি দান করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর এই অপেক্ষায়ই রইলেন এবং হিজরতের জন্য দুইটি উট তৈরী করে রাখলেন। একটি তার নিজের জন্য অপরটি মহানবী (সাঃ) এর জন্য। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৩১)

মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরত

কুরাইশরা যখন ব্যাপরটি জানতে পারল, তখন তারা মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য দারুন নদওয়াতে একত্রিত হল। কেউ কেউ তাকে বন্দী করে রাখার পরামর্শ দিল। আবার কেউ কেউ তাকে দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিল। কিন্তু তাদের মধ্যে চতুর লোকেরা বলল, এগুলির একটাও করা ঠিক হবে না। কেননা বন্দী করা হলে তাঁর সমর্থক ও আনসারগণ আমাদের উপর চড়াও হবে এবং তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তাকে দেশত্যাগী করলে তা হবে আরও ক্ষতিকারক। কারণ, এমতাবস্থায় মক্কার আশ পাশের লোকেরা তার ভদ্রতা সূলভ চরিত মাধূর্য, মিষ্টকথা ও পবিত্র কালামের গুণগ্রাহী হয়ে উঠবে এবং তিনি এ সকল লোককে নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করবেন। (মোগলতাঈ)

এজন্য হতভাগা আবু জাহেল প্রস্তাব করল যে, তাঁকে হত্য করা হউক এবং হত্যায় প্রত্যেক গোত্র হতে এক এক জন করে অংশ গ্রহণ করুক, যেন বনি আবদে মানাফ (মহানবী (সাঃ)এর কবিলা) প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। বৈঠকের সকলেই আবু জাহেলের অভিমত পছন্দ করল এবং তাদেরকে বলে দেওয়া হল যে অমুক রাত্রে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এদিকে আল্লাহ তাআলা মহানবী (সাঃ) কে কুরাইশদের সকল ষড়যন্ত্র জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে সত্বর হিজরতের হুকুম প্রদান করলেন। যে রাত্রে কাফের কুরাইশরা

তাদের হীন ষড়যন্ত্র পূরণ করবার ইচ্ছা করল এবং বিভিন্ন গোত্র সমূহ থেকে বহু যুবক মহানবী (সাঃ) এর বাসগৃহ ঘেরাও করল ঠিক সেই রাতেই মহানবী (সাঃ) হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। যাওয়ার সময় হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন, "তুমি আমার চাদর গায়ে দিয়ে খাটে শুয়ে থাক। তাহলে কাফেররা আমার অনুপস্থিতির কথা বুঝে উঠতে পারবেনা। অতঃপর মহানবী (সাঃ) যখন ঘর হতে বের হলেন, তখন তাঁর দরজায় কাফেরদের এক দল বসে ছিল। তিনি সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করতে করতে বের হলেন এবং যখন(১)

فاغشينهم فهم لا يبصرون

এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তা বেশ কয়েক বার পাঠ করলেন। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিলেন আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখতে পেলনা। তিনি সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এদিকে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) পূর্ব থেকেই তৈরী ছিলেন। এবং রাস্তাঘাট ভাল চিনে এমন লোককেও সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর সাথী হলেন এবং উভয়ে বাড়ির পিছনের পথে বাহির হলেন এবং সত্তর পর্বতের দিকে তাশ্রীফ নিয়ে গেলেন। (সওর হল মক্কার সন্নিকটে একটি পর্বত)

পাহাড়ের গুহায় অবস্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুর পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে কোরইশ যুবকরা সকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা যখন টের পাইল যে, মোহাম্মদের বিছানায় হযরত আলী শুইয়া আছেন, তখন তাহারা বিস্ময়ে বিমুঢ় হইয়া চতুর্দিকে তাঁহার সন্ধানে চর পাঠাইল এবং মোহাম্মদ (সাঃ)কে যে বন্দী করিতে পারিবে তাহাকে একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা দেওয়া হইল। অসংখ্য মানুষ তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। মক্কার কোন কোন "পদচিহ্ন বিশারদ" তাঁহার পদচিহ্ন ধরিয়া খোঁজ করিতে করিতে ঐ গুহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। আর সামন্য একটু ঝুঁকিয়া দেখিলেই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পষ্ট দেখিতে পাইত। এই সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) বিচলিত হইয়া উঠিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, "ভয় পাইও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন"। আল্লাহর কুদরতে কাফেরদের দৃষ্টি ঐ গুহা হইতে অন্য দিকে ফিরিয়া গেল এবং গুহার প্রবেশ পথে তৎক্ষণাৎ মাকড়শা ও জংলী

পার্শ্বটিকা ঃ (১) আমরা তাদের চোখে পরদা ঢেলে দিয়ে ছিলাম যাতে তারা দেখিতে পায়নি ।

কবুতর আসিয়া বাসা তৈরী করিয়া ফেলিল। সুতরাং কেহই গুহার অভ্যন্তরে ঝুঁকিয়া দেখিল না, বরং তাহাদের সবচাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি উমাইয়া বিন খালফ গুহার মুখে মাকড়শার জাল ও কবুতরের(১) বাসা দেখিয়া মন্তব্য করিল, এখানে তাহাদের থাকা সম্ভব নহে।

মহানবী (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সে গুহায় তিন রাত্রি লাগাতার আত্মগোপন করে রইলেন। পরিশেষে তালাশকারীরা নিরাশ হয়ে ফিরে যান।

ঐ তিন দিন রাতের অন্ধকারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর ছেলে আবদুল্লাহ গোপনে মহানবী (সাঃ) এর কাছে আসতেন এবং প্রভাত হওয়ার আগেই মক্কায় চলে যেতেন। সারাদিন কুরাইশদের খবরা খবর সংগ্রহ করে রাত্রি বেলায় তার নিকট এসে বর্ণনা করতেন। আবদুল্লাহর বোন হযরত আছমা (রাঃ) বিন্‌ত আবি বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রত্যেক রাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে খানা পৌঁছাতেন। আরবরা যেহেতু ছিল পদ চিহ্ন বিশারদ, সেহেতু আব্দুলাহ তার গোলামকে প্রতি দিন বকরিগুলি ঐ গুহার নিকটে চড়াতে আদেশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁর পদ চিহ্নগুলি মুছে যায়।

গারে সওর থেকে মদীনা যাত্রা

সওর পর্বতের গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন ৪ঠা রবিউল আউয়াল(২) রোজ সোমবার হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম আমের ইবনে ফুহাইর (রঃ) সেই উট দুটি নিয়ে উপস্থিত হলেন, যেগুলি এই সফরের জন্যই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তৈরী করে রেখেছিলেন। তার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে ওরায়কীত (রাঃ) ও এলেন যাকে তিনি পথ প্রদর্শক হিসাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

মহানবী (সাঃ) একটি উটের উপর সওয়ার হলেন এবং আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) অন্যটির উপর। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) খেদমতের জন্য আমের ইবনে ফুহাইরকেও সাথে নিয়ে নিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়কীতও পথ দেখাইবার জন্য আগে আগে চলতে ছিলেন। (সীরাতে হাকাবীয়া)

সুরাকা ইবনে মালেকের উপস্থিতি এবং তার ঘোড়ার পা মাটিগর্ভে ধ্বসে যাওয়া

মহানবী (সাঃ) মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এমতাবস্থায় কুরাইশী দূতগণের মধ্যে সুরাকা ইবনে মালেক মহানবী (সাঃ) কে তালাশ করতে করতে সেখানে পৌঁছে গেল সে যখন মহানবী (সাঃ) এর নিকটে এসে পড়ল

১। **পার্শ্ব টিকা ঃ** হযরত সহল বলেন, হেরেম শরীফের কবুতরসমূহ সেই কবুতরেরই বংশধর। (সীরাতে মোগলতাঈ)

২। মহানবী (সাঃ) এর জন্ম তারিখ থেকে ৫৩ বৎসর ও নবুয়ত প্রাপ্তির সময় হতে ১৩ বৎসর হয়।

তখন তার ঘোড়াটি হোছট খেলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। কিন্তু সে আবার ঘোড়ার পিঠে সওয়াব হয়ে মহানবী (সাঃ) এর পিছনে ধাওয়া করল এবং সে তার এত কাছে পৌঁছে গেল যে তার কুরআন তেলাওয়াত পর্যন্ত শুনতে ছিল। সেই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বারং বার ফিরে ফিরে সেই ঘটনা দেখতে ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তার প্রতি ফিরেও তাকালেন না। যখন সে অতি নিকটে এসে পড়ল তখন তার ঘোড়ার চারিটি পা শুকনা ও শক্ত মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ডেবে গেল। সুরাকা আবারও মাটিতে পড়ে গেল। এবার সে প্রাণ পন চেষ্টা করে ঘোড়াটিকে বের করতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে সে মহানবী (সাঃ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। তিনি থেমে গেলেন এবং তার বরকতে ঘোড়াটি মাটির ভিতর থেকে বের হয়ে আসল, তখন পায়ের গর্ত থেকে এক প্রকার ধোঁয়া বের হতে দেখে সুরাকা ঘাবড়ে গেল এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার সমস্ত পাথেয় সামগ্রী, উপস্থিত মাল সামান, উট ইত্যাদি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দরবারে পেশ করতে লাগল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেগুলি গ্রহণ করেননি। বরং তাকে বললেন, "তুমি যথেষ্ট যে, তুমি আমাদের অবস্থা কারও কাছে বলতে পারবেনা।" সুরাকা এখান থেকে ফিরে এল এবং যতক্ষন পর্যন্ত ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল ততক্ষণ কারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। (সীরাতে হালীয়া ১/৪৩৬)

সুরাকার মুখে মহানবী (সাঃ) এর নবুওয়তের স্বীকারোক্তি

কয়েক দিন পর সুরাকা আবু জাহলের কাছে এই ঘটনা ব্যক্ত করল এবং কয়েকটি পংতি পাঠ করল যার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

ওহে, আবু হেকাম(১) (আবু জাহ্ল) লাত নামক মূর্তির শপথ করে বলছি, ঘোড়াটি ভূ-গর্ভে ঢুকে যাওয়ার সময় তুমি যদি নিজ চোখে দেখতে, তাহলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে সত্য নবী এ ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ থাকত না। আমার মতে, তাঁর বিরোধিতা হতে বেচে থাকা এবং অন্যকেও বিরোধিতা করা হতে বিরত রাখ। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অদুর ভবিষ্যতেই তাঁর বিজয়ের নিশানা সমূহ এমনভাবে চমকিয়ে উঠবে, তখন সকল মানুষই কামনা করবে, আফ্‌সুস। আমরা যদি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সন্ধি করে নিতাম, তাহলে কত ভাল হত।"

(সীরাতে গোমগলতাঈ ৩৫ পৃষ্ঠা)

পার্শ্বটিকা ঃ (১) আবুজাহলের উপাধি সারা আরবে আবুল হেকাম ছিল। কিন্তু ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে তাকে আবু জাহল উপাধি দেওয়া হয়। এই ব্যাপারটি কবির ভাষায় বলেছেন ঃ - الناس كناه اباحكم-والله كناه اباجهل

মহানবী (সাঃ) এর মোজেযা

উম্মে মাবাদের স্বামীসহ ইসলাম গ্রহণ

মদীনা যাওয়ার পথে উম্মে মাবাদ নাম্নী এক মহিলা বাড়ীর পাশ দিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যাচ্ছিলেন। তার যে বক্‌রীগুলি পূর্বে দুধ দিতনা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেগুলির স্তনের উপর হাত বুলিয়ে দিলে তা পরিপুর্ণ হয়ে উঠে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে দুধ পান করলেন এবংসাথীগণকেও পান করালেন। আর এই বরকত এমনিভাবে অব্যাহত ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এখান থেকে বিদায় হওয়ার পর উম্মে মাবাদের স্বামী গৃহে এলেন এবং বকরীর দুধ সম্পর্কিত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে উম্মে মাবাদ বললেন, একজন অত্যন্ত শরীফ ও মর্যাদাশলি নওজোয়ান আজ আমাদের বাড়ীতে সামান্য সময়ের জন্যমেহমান হয়েছিলেন। এই সব তাঁর হাতেরই বরকত-সমূহ। স্বামী এসব শুনে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, ইনিতো মক্কাবাসীর সেই বুযুর্গ বলেই মনে হয়।ঃ অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এরপর তার স্বামী স্ত্রী দুইজনই হিজরত করে মদীনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

কুবায় অবতরণ

এখান থেকে রওয়ানা হয়ে মহানবী (সাঃ) কুবায় (সেটি মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান) পৌছিলেন। আনসার গণের কাছে যখন মহানবী (সাঃ) এর শুভাগমনের খবর পৌছল, তখন থেকে প্রতিদিন তাঁর সম্বর্ধনার জন্য মহল্লা থেকে বাইরে চলে আসতেন সেন দিন ও অন্যদিনের মত তাঁরা অপেক্ষা করে ফিরে চলে আসলেন। হঠাৎ এক আওয়াজ শোনা গেল যে তারা যাঁর অপেক্ষা ছিলেন। তিনি আগমন করেছেন। মহানবী (সাঃ) কে তাশরীফ আনতে দেখে সকলে ব্যাপক উদ্দীপনার সাথে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সহচরবৃন্দ কুবায় চৌদ্দ দিন(১) অবস্থান করলেন। এ সময়ই তিনি কুবায় এক মসজিদের গোড়াপত্তন করেন। সেটিই প্রথম মসজিদ, যা ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর নির্মিত হয়।

হযরত আলীর হিজরত ও কুবায় মিলন

মহানবী (সাঃ) এর আমানতদারী যেহেতু কাফেরের কাছেও স্বীকৃত ছিল, তাই অধিকাংশ লোকদের আমানত মহানবী (সাঃ) এর নিকট জমা থাকত।

পার্শ্ব টিকা ঃ (১) কুবায় অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে আরো মতপার্থক্য রয়েছে। তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন এবং অন্য এক বর্ণনায় বাইশ দিনের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা নং ৩৬)

হিজরতের সময় তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে এ জন্যই পিছে রেখে এসেছিলেন যে, যে সকল লোকজনের আমানত তার নিকট গচ্ছিত ছিল সেগুলি ঐ লোক জনের কাছে পৌঁছে তিনিও যেন তারপর মদীনায় চলে আসেন।

ইসলামী তারিখের সূচনা

এ সময় মহানবী (সাঃ) এর হুকুমে হযরত ওমর (রাঃ)(১) সর্বপ্রথম ইসলামী তারিখের সূচনা করেছেন এবং মুহার্‌রম মাস কে তার পহেলা মাস হিসাবে ধার্য করেছেন।

মদীনায় প্রবেশ

মহানবী (সাঃ) কুবা থেকে বিদায় গ্রহণ করে রবিউল আওয়াল মাসের শুক্রবার দিন মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। মদীনার আনসারগণ আনন্দের জোশে মহানবী (সাঃ) এর সাওয়ারীর চারদিকে চলতে লাগলেন। কেউ কেউ পায়ে হেঁটে আবার কেউ কেউ সাওয়ার হয়ে পথ চলছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর উটনীর লাগাম ধরে সম্মুখ দিকে টানবার জন্য সকলের সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে ছিলেন। সকলের মনের বাসনা তাই ছিল যে, মহানবী (সাঃ) তার বাড়ীতে অবস্থান করুক। মহিলা ও শিশু-কিশোরগণ খুশির বাক্য গাচ্ছিল। সেই দিনটি ছিল শুক্রবার। বনি সালেম নিকট জুমাআর নামায আদায় করতঃ পুণরায় সওয়ার হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে যে আনসারী সাহাবীর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনিই মহানবী (সাঃ) কে তার বাড়ীতে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু নবীজি বলতে ছিলেন, তোমরা উটনীটিকে নিজের গতির উপর ছেড়ে দাও, কেননা, সে আল্লাহর হুকুমের উপর আদিষ্ট।

যে জায়গায় অবস্থানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একে হুকুম করা হবে সে স্থানে গিয়ে সে নিজেই থেমে যাবে। সুতরাং উটনীটি এভাবেই চলতে লাগল। অবশেষে সে মহানবী (সাঃ) এর মামার বংশ বনী আদী ইবনে নাজ্জারের এলাকায় হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এর বাড়ীর সামনে গিয়ে বসে পড়ল। মহানবী (সাঃ) আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এর মেহমান হয়ে গেলেন। এবং বেশ কিছু দিন যাবৎ তার ঘরেই অবস্থান করলেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

তখন পর্যন্ত মদীনাতে কোন মসজিদ ছিলনা। যেথায় নামাজের সুযোগহত সেথায় নামাজ আদায় করে নেয়া হত। এর পর উটনিটি যে জায়গাটিতে বসে

পার্শ্বটিকা ঃ (১) শায়খ জালালুদ্দীন সয়ুতী তা তাই সমর্থন করেছেন।

ছিল সে জায়গাটি ক্রয় করা হল। সে জায়গাটিতে মসজিদে নববী তৈরী করা হল(১) যার দেওয়ালসমূহ ছিল কাঁচা ইটের তৈরী, খুটি ছিল খেজুরের গাছের আর ছাদ ছিল খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত। কেব্‌লা রুখ্ বায়তুল মুকাদ্দসের দিকে রাখা হল (সে সময় মুসলমানের কেব্‌লা ছিল) মসজিদের সাথে দুইটি হুজরাও তৈরী করা হল।

একটি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর জন্য এবং অন্যটি হযরত সাওদার (রাঃ-আন্‌হার) জন্য। অতঃপর মহানবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে মক্কায় এ মর্মে পাঠালেন, যেন তাঁর পরিবারবর্গকে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। সে সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর পরিবার পরিজনকে মদীনায় আনিয়ে নেন। সুতরাং উম্মে মোমেনীন হযরত সাওদা (রাঃ আন্‌হা) এবং দুই সাহেব যাদী হযরত ফাতেমা (রাঃ-আন্‌হা) ও উম্মে কুলসুম (রাঃ–আনহা) মদীনায় চলে আসেন। তৃতীয় সাহেবযাদী হযরত যয়নব (রাঃ-আনহা) কে তার কাফের স্বামী মদীনায় আসতে বাঁধা প্রদান করে। আবুল আস্ তখনও কাফের ছিল। মদীনায় আসতে বাঁধা প্রদান করে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর সাহেব যাদা হযরত আবদুল্লাহ তাঁর মাতা ও দুই বোন (হযরত আয়েশাও হযরত আসমা) কে নিয়ে মদীনায় চলে আসেন। ভ্রমণ করার ক্ষমতা যাদের নেই এইরূপ অক্ষম কতিপয় মুসলমান রয়ে গেলেন। বরং অক্ষম লোকদের মধ্য হতেও কেউ কেউ মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়ছিলেন কিন্তু পথিমধ্যেই তাদের ইন্‌তেকাল হয়।

হিজরী প্রথম সনে জিহাদের অনুমোদন

সারিয়া হাম্‌যা ও সারিয়া ওবায়দা (রাঃ)

মহানবী (সাঃ) এর ৫৩ বৎসর জিন্দেগীর সংক্ষিপ্ত একটি নক্‌শা পাঠকবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করা হল। যাতে বিস্তারিত বর্ণনার দ্বারা তাও বুঝা গেছে যে, পৃথিবীতে ইসলামের প্রসারও প্রচার কিভাবে হয়েছিল। প্রত্যেক শ্রেণীও প্রত্যেক গোত্রের হাজারো মানুষ হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ

পার্শ্বটিকা ঃ (১) এর পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফত কালে আরো জায়গা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু নির্মাণ কাজ আগের মতই বহাল রাখেন। তার পর হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফত কালে তাতে বিরাট পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করেন। জায়গা অনেক বাড়িয়ে দেন এবং দেওয়াল সমূহ নক্‌শাযুক্ত পাথরও রুপার কারুকার্য দ্বারা, খুঁটি সমূহ নক্‌শাযুক্ত পাথর আর ছাদ শাল কাট দ্বারা নির্মাণ করেন। অতপর হযরত ওমর ইবনে আঃ আযিয (রাঃ) লৌদ ইবনে আঃ মালেকের যামানায় তদীয় হুকুমে মাসজিদের প্রসস্থতা আরো বাড়িয়ে দেন এবং পবিত্র রমণী গণের বাসভবন সমূহকে এর মধ্যে শামিল করে দেন। অত পর ১৬০ হিজরীতে খলীফা মাহদী এবং ২০২ হিজরীতে খলীফা মামুন তাতে পরির্তন পরিবর্ধন করেন এবং এর বুনিয়াদ কে অতিশয় মযবুত করেন। অতঃপর বনি ইসমানীয় খলীফাগণ অত্যন্ত মনোরম ও সুন্দর করে নির্মাণ করেন যা আজ ও বিদ্যমান রয়েছে।

করে এমনই আগ্রহ প্রকাশ করে ছিল যে, তাঁরা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে নিজেদের সহায় সম্পত্তি, বাপ-দাদা, বিবি-বাচ্চা হতে বরং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করতেন। তাঁদের ইসলামে প্রবেশ হওয়ার কারণ কি ছিল? রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জোর জবরদস্তি, অথবা ধন-সম্পদের লোভ বা সম্মান প্রতিপত্তির লোভ কিংবা কোন সশস্ত্র বাহিনীর তরবারীর ভয় তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল? নাকি তার পিছনে অন্য কোন কারণ ছিল? কিন্তু যখন এই নিরক্ষর নবীর (সাঃ) এর উপর দৃষ্টিপাত করা যায় তখন নিঃসন্দেহে এসবের নীতিবাচক জবাব পাওয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, সে এতীম সন্তানটি যার গৃহে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জালাবার সুযোগ পর্যন্ত আসতনা, যার গৃহবাসীগণ কোন সময়ই পেট ভরে খানা খেতে পেতনা যার হাতে গোনা আত্মীয় স্বজনও একটি মাত্র সত্যের কালেমা বলার কারণে শুধু তার কাছে থেকে দুরেই সরে গিয়েছিল তাই নয়, বরং শক্ত-দুশমনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, তিনি কি কারো উপর রাজেত্ব কায়েম করার লোভ করতে পারেন অথবা ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে বা তরবারীর জোরে কাউকেও নিজ মতাদর্শ উৎসাহিত করতে পারেন? এছাড়া ইতিহাসের একটি বড় দফতর আমাদের সামনে রয়েছে যাতে বিনা মাতনৈক্যে একথা বিদ্যমান রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র জীবনের ৫৩ বৎসর এভাবে অতি বাহিত হয়েছে যে, প্রথম জীবনের সহায় সম্বলহীনতা ও অসহায়ত্বের পরে যখন ইসলাম অনেকটা প্রকাশ্য শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিল এবং বড় বড় বীর ও বিত্তশালী সাহাবী ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেছিল সেই ইসলাম কোন কাফেরের গায়ে হাত উঠায়নি বরং অত্যাচারীদের অত্যাচারেরও কোন জবাব পর্যন্ত দেয়নি। অথচ মক্কার কাফেররা শুধু মহানবী (সাঃ) নয় বরং তারা সকল আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজনে, বন্ধু-বান্ধব ও অনুসারীগণের উপর এমন অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে যে তা বলে এবং লিখে প্রকাশ করা যাবেনা। কুরাইশ কাফেরারা সর্ব শক্তির অধিকারী ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সকল নির্যাতন এমনকি তাকে হত্যাকরার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন কৌশল বাকী রাখে নাই। যেমনঃ দীর্ঘ তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁকে ও তাঁর সকল অনুসারী এবং অনুরাগীগণসহ অবরুদ্ধ করে রাখা, তাঁর সাথে কুরাইশদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন রাখা, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও সাহাবাকেরামের প্রতি নানান নির্যাতন ইত্যাদি যা আপনারা অবগত হয়েছেন। এসব কিছু সত্বেও কোরআন তাঁর অনুসারীগণকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেয় নাই। অবশ্য তখন যে জেহাদের

হুকুম ছিল, তা হলঃ কাফের দেরকে কৌশল ও(১) উপদেশ মূলক কথাবার্তার দ্বারা আপন প্রভুর দিকে ডাকো, যদি পরস্পরে বির্তকের সৃষ্টি হয় তাহলে কৌশল এবং নম্র কথার মাধ্যমে তাদের মোকাবিলা করো এবং কুরআনের প্রকাশ্য দলীল প্রমাণাদির দ্বারা তাদের সাথে পূর্ণ জেহাদ করো যেন তারা সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

এ সময় পর্যন্ত যে হাযার মানুষ ইসলামে দলভূক্ত হয়ে সর্ব প্রকার মসিবতের নিশানায় পরিণত হতে রাযী হয়েছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, তারা দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা অথবা রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা কিংবা তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারেন না। এই প্রকাশ্য বাস্তবতা দেখাবার পরেও কি তারা আল্লাহর প্রতি শরমিন্দা হবেনা, যারা ইসলামের সত্যাসত্যের উপর পর্দা ঢালার উদ্দেশ্যে বলে বেড়ায় যে, ইসলাম তারবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে? তারা কি এ প্রশ্নের জবাবদিতে পারবে যে, এ সকল তরবারী চালাতে চালনাকারীগণের উপর কারা তরবারী চালনা করেছিল যারা শুধু মুসলমানই হন নাই, বরং ইসলামের সাহায্যার্থে তরবারী চালাতে এবং নিজেদের জীবন কে বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করতে পর্যন্ত রাযী হয়েছিলেন? তারা কি বলতে পারে, হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ এর উপর কে তরবারী চালিয়ে তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে ছিল? হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ), হযরত উনাইস (রাঃ) এবং তাদের গোত্রকে কে বাধ্য করে ছিল যে, তারা সকলেই এসে ইসলামে প্রবেশ করে ছিলেন? নাজরানের খৃষ্টান গণের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করেছিল যে, তারা মক্কায় এসে স্ব-ইচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলেন? যেমাদ আযদীকে কে বাধ্য করেছিল? তোফায়েল ইবনে আমরদুসী (রাঃ) এবং তার বংশের লোকদের উপর কে তরবারী চালিয়ে ছিল? বনি আব্দুল আশহাল গোত্রের উপর কে চাপ সৃষ্টি করেছিল? মদীনার সমস্ত আনসার গণের উপর কে বল প্রয়োগ করেছিল যে তারা শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি বরং মহানবী (সাঃ) কে আহবান করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে সকল যিম্মাদারী তার জন্য উৎসর্গ করে দিলেন? হযরত বুরাইদা আসলামী (রাঃ) কে বল প্রয়োগ করেছিল যার ফলে তিনি তার গোত্রের ৭০ জন লোকের একটি জামাত নিয়ে মদীনার পথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হন এবংস্ব-ইচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলেন? হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর উপর কোন্ তারবারী

পার্শ্বটিকা ঃ (১) পবিত্র কোরআনের আয়াত এর ভাবার্থ ইহাই

ادع الى سبيل ربك بالحكمة ه والموعظة الحسنه

চালিয়েছিল যে, তিনি তার বাদশাহী ও শানশওকত থাকা সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন? আবু হিন্দ, তামীম, নায়ীম ইত্যাদি ব্যাক্তি বর্গের উপর কে জোর প্রয়োগ করেছিল যে, তারা সুদুর সিরিয়া হতে সফর করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র খেদমতে হাজির হলেন এবং তার খেদমত বরণ করে নিলেন? এমনি ধরনের শত শত ঘটনায়(১) ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ রয়েছে। তাদের এক পেশে দৃষ্টিসমূহ যা দেখে প্রত্যেকটি মানুষ এই বিশ্বাস না করে পারেনা যে, ইসলাম নিজ মহিমা প্রচারে তরবারীর মুখাপেক্ষী(২) ছিল না"।

ইসলাম নিজ প্রচারে তরবারীর মুখাপেক্ষী নয়

জিহাদ ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য এ হতে পারে না যে, মানুষ গলায় তরবারী রেখে বলা যে, মুসলমান হয়ে যাও নতুবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করানো হবে। জিহাদের সাথে সাথে জিযিয়া(৩) নামক করের নির্দেশ এবং কাফেরদের যিম্মী বানিয়ে তাদের জান মাল মুলমানের মতই হেফাজত সম্পর্কীয় ইসলামী বিধানাবলী স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য বহন করে যে, ইসলাম কখনও কোন কাফেরের জিহাদ ফরয হওয়ার পরও মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করেনি। এ জন্যই একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অবশ্য কর্তব্য হল তিনি যেন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেন যে, ইসলামে কি উদ্দেশ্যে এবং কোন কোন্ উপকারিতার জন্য জিহাদ ফরয করা হয়েছে। এবং তার সেই সময় বিশ্বাস করতে হবে যে, যেমনিভাবে সেই ধর্ম মতকে পরিপূর্ণ মনে করা যায় না, যেটি মানুষের গলায় ফাঁস লাগিয়ে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের অনুসারী বানিয়েছে, তেমনি ভাবে সেই ধর্মও পরিপূর্ণ নহে যাতে রাজনীতির স্থান নাই এবং সেই রাজনীতিও পরিপূর্ণ নহে যাতে তরবারীর ব্যবস্থা নেই। সেই ধর্ম অপরিপূর্ণ যাতে রাজনীতি সেই আর সেই রাজনীতিও অপরিপূর্ণ যাতে তরবারী নেই। সেই ডাক্তার নিজের পেশায় কখনও দক্ষ হতে পারে না, যে

পার্শ্বে টিকা ঃ (১) এ সমস্ত ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তকারে রেসালায়ে হামীদিয়া নামক পুস্তক হতে সংগৃহীত করা হয়েছে।

(২) পাঠক বৃন্দ যদি সত্যিকারার্থে বিশুদ্ধভাবে পৃথিবীর বুকে ইসলাম কেমন করে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে তা জানতে চান তাহলে দয়াকরে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহ্তামিম হযরত মাওঃ হাবীবুর রহমান (রাঃ) রচিত এশাআতে ইসলাম নামক গ্রন্থ খানা পাঠ করবেন।

(৩) সেই কর যাহা কাফেরদের কাছ থেকে তাদের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য গ্রহণ করা হয় তাকে জিযিয়া বা সামরিক কর বলা হয়।

শুধু মলম লাগাতে জানে কিন্তু দুষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অপারেশন করতে জানে না। কবির ভাষায়–

کوی عرب کی ساتھ ہویاھوعجم کی ساتہ
کجہ بہیر ھی تیغ نہ ھوجب قلم کی ساتہ

"আরবী বা অনারবী যে দলেই তুমি থাক কলমের সাথে সাথে তরবারী টুকু রাখো" ।খুব ভাল করে বুঝে রাখ যে, পৃথিবীর সারা শরীরে যখন শিরকের বিষাক্ত জীবানু সৃষ্টি হল এবং উহা একটি রোগীর দেহের মত হয়ে পড়ল, তখন আল্লাহ তাআলা এর একজন সংস্কারক ও দরদী ডাক্তার (মহানবী (সাঃ) কে প্রেরণ করলেন। যিনি তার জীবনের ৫৩ টি বৎসর ধারাবাহিক ভাবে এর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শিরা-উপশিরা নিরাময় করে তোলার চিন্তা ভাবনা করলেন। যার ফলে, নিরাময় যোগ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুহ সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু কোন্ কোন্ অঙ্গ যেগুলি পচে গিয়েছিল সেগুলি নিরাময়ের কোন উপায় রইল না বরং আশংকা দেখা দিল যে বিষক্রিয়া সারা শরীরে অনুপ্রবেশ করবে। এ জন্য বিজ্ঞ ডাক্তারের নিয়মানুযায়ী পছনশীল অঙ্গগুলিকে অপারেশনের মাধ্যমে কেটে দেওয়াই করুণা ও প্রজ্ঞার তাগিদ। এটাই জেহাদের হাকীকত এবং এটাই সারা আক্রমণাত্মক ও বাঁধাদান মূলক অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণেই যুদ্ধের ময়দানে তুমুলযুদ্ধ চলাকালেও ইসলাম তার প্রতিপক্ষের শুধু ঐ সব লোককে হত্যাকরার অনুমতি দান করেছে যেসব লোক ষড়যন্ত্র করত এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধ অবতরণ করত। তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত মহিলা, কিশোর ও বৃদ্ধ এবং সেই সকল ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত না তারা সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানদের তরবারী হতে নিরাপদ ছিল। বরং এই সব লোক যারা কোন চাপের মুখে অপরাগ হযে যুদ্ধ আগমন করত তারাও মুসলমানের হাত হতে নিরাপদ ছিল। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন– বদরের যুদ্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশ প্রদান করলেন যে বনি হাশেমের কোন লোক যদি তোমাদের সামনে আসে তাকে হত্যা করবে না কেননা, তারা নিজ ইচ্ছায় যুদ্ধে আগমন করেনি। বরং তাদেরকে বল পূর্বক আনা হয়েছে।

(কানযুল উম্মাল, ৫/২৭২ পৃঃ)

এমন কি যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য আগমনকারী ও সরাসরী যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেও যথা সম্ভব সেই সব লোকদেরকে রক্ষা করা হত যাদের সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জানতেন যে তাদের চরিত ও আচার আচরন উত্তম। নিম্নের ঘটনা আমাদের দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করে। অষ্টম হিজরীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন পথিমধ্যে এক লোক তার

খেদমতে হাযির হল এবং যুদ্ধের সাথে তুলনা করে নিবেদন করল যে, আপনি যদি সুন্দরী নারী আর লাল উট পাবার আশা রাখেন, তাহলে বনি মুদাল্লাজ গোত্রের উপর আক্রমণ করুন। কেননা, তাদের মধ্যে এই দুইটি জিনিষ প্রচুর রয়েছে কিন্তু এখানে যুদ্ধ আর সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহপাক আমাকে বনি মুদাল্লাজ গোত্রকে আক্রমন করতে এজন্যই বারন করেছেন যে, তারা পরস্পরে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (এহ্ইয়াউল্-উলুম দ্রঃ) হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে সাতজন যুদ্ধ বন্দীকে হাজির করা হলে নবীজি তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। এমনি সময় জিব্রাঈল (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ছয় জনের ব্যাপারে এই হুকুমই বহাল রাখুন কিন্তু ঐ লোকটিকে মুক্তি দান করুন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সে উত্তম চরিতের অধিকারী ও দানশীল। নবীজি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নিজের পক্ষ হতে এই সুপারিশ করছেন, না তা আল্লাহর আদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলাই আমাকে এর আদেশ করেছেন। কান্‌যুল উম্মুল,-১৩৫ পৃঃ ব- হাওয়ালা ইব্‌নে জাওযী ইসলামী জিহাদ তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয়ান গোষ্টীর পৃথিবী ধ্বংস যুদ্ধ ছিলনা যাতে শুধু নিজেদের কামনা বাস্‌না পুরণ করার জন্য নারী পুরুষ, দোষী ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কবি আকবর এলাহবাদী যথার্থই বলেছেন–

هو رهاهی نفاذ حکم فنا
نه مکیر اس سی بجتی هی نی مکان–
تو یسن خود آکی ابتومیدان میر
یرهی هیرکل من علیها فان–

ধ্বংশের বানী সশব্দে বেজেছে
মানুষ পুড়িছে সেথায়, যেথায় তার ঘর।
বারুদ নিজেই মাঠে করে পাট,
সব কিছু পুড়ে যাবে এর পর।

কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই যে, মানুষ অন্য মানুষের চোখে সমান্য ধুলিকনা পড়লেও তা দেখতে পায় কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাটকেও নযরে পড়েনা

(১) কবি আরও বলেছেনঃ

اپنی عیبود کی نہ کچہ پرواھی
غلط الزام بس اوروں پر لگا رکھاھی
یھی فرماتی رھی تیغ سی پہیلا اسلام
یہ نہ ارساد ھوا توپ سی کیا پہیلاھ

অর্থাৎঃ- আপন দোষের পরয়া করেনা,
মিথ্যা অভিযোগ অন্যকে দেয়।
অস্ত্রের জোরে মিথ্যা বলে ইসলাম ছড়ালো সব জাগায়,
এতকিছু বলে তবু না কহিল বারুদের দ্বারা কিকি ছড়ায়,

মোট কথা আত্মরক্ষামুলক ও আক্রমনাত্মক উভয় জিহাদেরই উদ্দেশ্যছিল শুধু মাত্র উত্তম চরিতের প্রসার ঘটানো, ইসলামের হেফাযত আর ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেসমস্ত বাধা প্রদান করা হয় তার অপসারণ।

এ সকল ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করবার পর যেমনি ভাবে সাধারন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগন এবং মার্গালিউস প্রমুখদের এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা প্রমানিত হয় যে, ইসলামী জিহাদের মুল উদ্দেশ্য মানুষকে জোর পুর্বক মুসলমান করা এবং লুট পাটের দ্বারা নিজেদের জীবিকা তৈরী করা তেমনি ভাবে ইসলামী বর্ণনা গুলি ও সাহাবীগনের ধারাবাহিক কর্মসমুহ একত্রিত করার উদ্দেশ্যে জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, তেমনিভাবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাধাপ্রদান সমুহকে মিটাইবার জন্য আক্রমনাত্মক জিহাদ ও কিয়ামত পর্যন্ত জরুরী করা হয়েছে (২) যেমনিভবে আত্মরক্ষামুলক জিহাদের উদ্দেশ্যে শুধু মানুষকে মুসলমান বানানো নয় ঠিক তেমনি ভাবে আক্রমনাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্যেও কাউকে মুসলমান বানানো নয়। বিশেষঃ মুল রনক্ষেত্রে ও ইসলামের প্রশস্ত আচঁল কাফেরগণকে নিজের আশ্রয়ে স্থান

পর্শ্বটিকা ঃ (১) ইউরোপীয়ানদের রক্তাক্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা গুলিকে যদি সমানে রাখা হয়, যা স্পেনের উত্থান-পতনের সাথে সম্পর্কিত তাহলে তাদের সভ্যতার ও সংস্কৃতির মুখোস খুলে যাবে। কেননা, স্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা ও গোলাগুলি, হত্যা হাইজ্যাক ইত্যাদি বিভিন্ন জুলুম-অত্যাচার দ্বারা মুসলমানদের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহনে বাধ্য করা হয়েছে। শতশত আল্লাহর বান্দাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয়েছে, হাযার হাযার লোককে হত্যা করা হয়েছে, শতশত লোককে গ্রেফতার করে তাদের সামনে তাদের সন্তানদেরকে যবেহ করা হয়েছে লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলমান তাদের দ্বীন কে হেফাযত করবার জন্য হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। গ্রানাডার ময়দানে মুসমানদের লিখিত ৮০ হাযার মুল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পান্ডুলিপির অতুলনীয় ভান্ডরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ১৬ শতাব্দীতে রাজা ফিলীপ স্বীয় শাসনাধীন এলাকায় আরবী ভাষায় একটা বাক্য উচ্চারণ করাও অপরাধ বলে ঘোষনা করেছেন। মুসলমানদের স্মৃতিগুলিকে এক এক করে মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। কর্ডোভার অদ্বিতীয় জামে মসজিদে অসংখ্য গীর্জা তৈরী করা হয়েছে। এখানকার হামরাও যোহরা প্রাসাদ সারা জাহানের মধ্যে অদ্বিতীয় ইমারত ছিল এবং যা ১২ হাযার গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল। اشهد ان لاالها الاالله এর আওয়াজে স্বরগরম ছিল উহার মধ্যে তিন কোন বিশিষ্ট খুঁটি ও গীর্জা তৈরী করা হয়েছে যাহা এখনও বিদ্যমান। (এ সব বর্ণনা আল্লামা করদে আলী রচিত غابرالانس وحاضرها গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে তাতে স্পেনের অতীত ও বর্তমান কালের তুলনামুলক আলোচনা করেছেন।)

২। (১) মহানবী (সাঃ) এর হাদীস الجهادماض الى يوم القيامة এর মর্মাথ ও ইহাই।

দিতে এবং কুফুরীর উপর থাকার পরেও তাদের জান-মাল এবং মান-সম্মানকে তেমনিভাবে হেফাজত করার জন্য প্রসারিত রয়েছে, যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে হেফাজত করা হয়। যাতে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমনাত্মক জিহাদ উভয়ই সমান। বস্তুত দুনিয়াতে সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করা, দুর্বলদেরকে প্রতাপশালী যালেমদের কবল হতে রক্ষা করা ইত্যাদি যা জিহাদের মুল উদ্দেশ্য তাতে উভয় প্রকার জিহাদের ভুমিকাই সমান সমান।

তাই বলে এরূপ প্রয়োজন নেই যে, ইসলামী বর্ণনা-বৃতি গুলিকে বিকৃত করে আক্রমনাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করতে হবে। যেমন আমাদের কোন স্বাধীন ও মুক্ত মনের অধিকারী ঐতিহাসিকগন করে থাকেন। এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর আমরা আমাদের মুল বিষয় শুরু করছি।

হিজরতের পর জিহাদ ও অভিযানের সিল্‌সিলা শুরুহল। এ সকল যুদ্ধভিযানের কোনটিতে স্বয়ং মহানবী (সাঃ) সশরীরে অংশ গ্রহন করেন, আর কোনটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিকগনের পরিভাষায় প্রথম যুদ্ধাভিযানকে গায্‌ওয়াহ আর দ্বিতীয় প্রকার যুদ্ধভিযানকে সারিয়াহ্‌ বলা হয়। গাযওয়াহর মোট সংখ্যা ২৩টি। তন্মধ্যে ৯টিতে যুদ্দ সংঘটিত হয়েছিল। অন্যান্যগুলিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সর্ব মোট সারিয়াহর সংখ্যাহল ৪৩ টি। তাতে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এটাই এ সকল গাযওয়াহ এবং সারিয়াহর মধ্যে মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত ও সৈন্য সংখ্যাকম থাকা সত্বেও বিজয় তাদের পক্ষেই থাকে। অবশ্য শুধু উহুদ যুদ্ধে প্রথমতঃ মুসলমানগন বিজয় লাভের পর পরবর্তী এক পর্যায়ে তাদের পরাজয় ঘটে,তাও এজন্য যে, সৈন্যদের একদল মহানবী (সাঃ) এর আদেশ অমান্য করেছিল। আমরা এসকল গয্‌ওয়াহ্‌ ও সারিয়াহ সমুহকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য বর্ষওয়ারী নক্‌শা আকারে নিম্নে পেশ করছি। কেননা গাযওয়াহ ও সারিয়াহ্‌ সমূহের তারিখ এবং সংখ্যায় অনেক মতভেদ আছে, এজন্যই আমরা সকল মতভেদ বর্জন করে হাফেযে হাদীস আল্লামা মোগলতাই (রহঃ) বিরচিত সীরাতের উপর আস্থা পোশন করেছি। নক্‌শা নিম্নরূপঃ

গাযওয়াহ্‌ ও সারিয়াহ

প্রথম হিজরী– দুইটি সরিয়াহ মহানবী (দঃ) প্রেরণ করেছিলেন। যথাঃ (১) সারিয়াহ হামযা (রাঃ) (২) সারিয়াহ ওবায়দাহ (রাঃ)।

দ্বিতীয় হিজরী– পাঁচটি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল। যথাঃ

(১) গাযওয়াহ আবওয়াহ, যাকে গাযওয়াহ উদ্দানও বলা হয় (২) গাযওয়াহ বাওয়াত, (৩) গাযাওয়াহ বদ্‌রে কুব্‌রা, (৪) গাযওয়াহ বনি কাইনুকা, (৫) গাযওয়াহ সাভীক। এবং তিনটি সারিয়াহ প্রেরিত হয়েছিল, যথা (১)

সারিয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, (২) সারিয়াহ ওমাইর, (৩) সারিয়াহ সালেম। এ বৎসর সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ গাযওয়াহ বদর।

তৃতীয় হিজরী– এতে তিনটি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল। যথাঃ

(১) গাযওয়াহ্ গাত্ফন (২) গাযওয়াহ উহুদ, (৩) গাযওয়াহ হাম্রাউল আসাদ। এবং দুইটি সারিয়াহ প্রেরিত হয়েছিল। (১) সারিয়াহ্ মুহাম্মদ সমূহের মধ্যে গাযাওয়াহ উহুদই গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ হিজরী– উক্ত হিজরীতে দুইটি গাযওয়াহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যথাঃ (১) গাযওয়াহ বনি নযীর, (২) গাযওয়াহ বদরে সুগ্রা। এবং চারটি সারিয়াহ পেরন করা হয়েছিল। যথাঃ (১) সরিয়াহ আবু সালমা, (২) সারিয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস, (৩) সারিয়াহ মুন্যির, (৪) সারিয়াহ মারছাদ।

পঞ্চম হিযরী– তাতে চারটি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল। যথাঃ

১। গাযওয়াহ্ যাতুন- রেকা, ২। গাযওয়াহ্ দুমাতুল জান্দাল, (৩) গাযওয়াহ মুরাইসী (যাকে গাযওয়াহ বনি মুস্তালেকা বলা হয়। ৪। গাযওয়াহ্ খন্দক। তাতে গাযওয়াহ্ খন্দক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ হিজরী – তাতে তিনটি গাযওয়াহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যথাঃ

১। বনি লাহ্ইয়ান ২। গাযওয়াহ গাবাহ্। যাকে গাযওয়াহ গাযওয়াহযী-কারাদ ও বলা হয়। (৩) গাযাওয়াহ হোদাইবিয়া।

এবং উল্লেখিত হিজরীতে এগারটি সারিয়াহ প্রেরিত হয়েছিল যথাঃ ১। সারিয়াহ মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা ২। সারিয়াহ্ আক্কাশা, ৩। সারিয়াহ মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা যিলকুস্সাভিমুখে, ৪। সারিয়াহ যাযেদ ইবনে হারেসা বনী সুলাইম অভিমুখে, ৫। সারিয়াহ আঃ রাহমান ইবনে আউফ ৬। সারিয়াহ আলী, ৭। সারিয়াহ যায়েদ ইবনে হারেসা উম্মে কারফা অভিমুখে, ৮। সারিয়াহ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক, ৯। সারিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ ১০। সারিয়াহ কুরয্ ইবনে জাবের, ১১। সারিয়াহ আমর আয যাম্রী। এই বৎসরের গাযওয়াহ সমুহের মধ্যে হোদায়বিয়ার গাযওয়াহ-ই সবচেয়ে গুরুত্ব পুর্ণ।

সপ্তম হিজরী– এই বৎসরে মাত্র একটি গাযওয়াহ যা গাযওয়াহ খায়বর নামে সংঘটিত হয়েছিল। এবং পাঁচটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথাঃ

১। সারিয়াহ আবু বকর, ২। সারিয়াহ বিশ্র ইবনে সাদ, ৩। সারিয়াহ গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ, ৪। সারিয়অহ বশীর ৫। সারিয়াহ আহযাম।

অষ্টম হিজরী– এই বৎসর চারটি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল। যথাঃ

১। গাযওয়াহ্ মুতা ২। মক্কা বিজয়, ৩। গাওয়াহ হোনাইন, ৪। গাযওয়াহ তায়েফ। এবং দশটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথাঃ ১। সারিয়াহ গালিব– বানী মুলাইব অভিমুখে, ২। সারিয়াহ্ গালিব-ফাদাক অভিমুখে, ৩। সারিয়াহ শুজা, ৪। সারিয়া কাব, ৫। সারিয়াহ্ আমর ইবনুল আস, ৬। সারিয়াহ্ আবূ ওবাইদা ইব্নুর আমর জাররাহ্। ৭। সাবিয়াহ আবু কাতাদাহ্ ৮। সারিয়াহ খালেদ যাঁকে গুমায়সাও বলা হয়। ৯। সারিয়াহ তোফায়েল ইবনে আমর দূসী, ১০। সারিয়াহ্ কাতবাহ্।

নবম হিজরী– এই বৎসর শুধু তাবুক যুদ্ধাভিযানই সংঘটিত হয়েছিল। যা গুরুত্ব পূর্ণ যুদ্ধাভিযানের অন্তর্ভূক্ত। এবং তিনটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথাঃ ১। সারিয়াহ্ আলকামা, ২। সারিয়াহ্ আলী, ৩। সারিয়াহ্ আক্কাশা।

দশম হিজরী– এই বৎসর শুধু দুটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথা ঃ ১। সারিয়াহ খালেদ ইবনে ওয়ালিদ– নাজরানের প্রতি।

২। সারিয়াহ আলী– ইয়ামনের প্রতি। এই বৎসরই বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

একাদশ হিজরী– এই বৎসর শুধু মহানবী (সাঃ) হযরত উসামা এর নেতৃত্বে একটি মাত্র সারিয়াহ্ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যা তার ওফাতের পর রওয়ানা হয়েছিল।

মোট গাযওয়াহর সংখ্যা ২৩টি এবং সারিয়াহর সংখ্যা ৪৩টি। এখানে একটি কথা লক্ষ্যনীয় যে, মুহাদ্দিস ও ইসলামী ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় গাযওয়া এবং সারিয়াহ্ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ এত সাধারণভাবে করা হয়েছে যে, সামান্য ঘটনা সমুহকে গাযওয়া ও সারিয়াহ্ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যদি এক অথবা দুইজন লোক কোন দোষী লোককে গ্রেফতার করার জন্য গমন করত তাহলে ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় একে সারিয়াহ নামে অভিহিত করা হত। এমনি ভাবে গাযওয়াহ শব্দের অর্থের বেলায়ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় অত্যন্ত ব্যাপকতা হয়েছে। এ জন্যই গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহর সর্বমোট সংখ্যা উল্লেখিত শিরোনামের বর্ণনা অনুযায়ী ছিষট্টি পর্যন্ত পৌঁছে। নতুবা আমাদের প্রচলন অনুযায়ী গাযওয়াহ ও জেহাদ যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকে মনে করা হয় তা এ সকল ঘটনাসমূহের মধ্যে মাত্র কয়েকটি। এগুলি কোন রকম বিশ্লেষণসহ পাঠক বৃন্দের সামনে পেশ করা হল।

গরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ ও সারিয়াহ এবং বিভিন্ন ঘটনাসমূহ

হযরত হামযার নেতৃত্বে প্রথম সারিয়া

হিজরতের ৭ মাস(১) পরে মাহে রমযানুল মোবারকে মহানবী (সাঃ) হযরত হামযা (রাঃ) কে ৩০ জন মুহাজেরের দলপতি নিযুক্ত করে একটি সাদা পতাকাসহ কুরাইশদের একটি কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করে ছিলেন। কিন্তু যখন মুহাজেরীনগণ সাগরের তীরে উপনীত হলেন এবং পরস্পরে মোকাবেলা হল তখন মাজদী ইবনে ওমর জুহানী উভয় দলের মধ্যে মধ্যস্থাতা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেন।

সারিয়া ওবায়দা ইবুনুল হারেছ এবং ইসলামে তীরন্দজীর সূচনা

অতপর মহানবী (সাঃ) প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত ওবায়দা ইবনে হারেছ (রাঃ) কে ৬০ জনের দলপতি করে বাতেনে রাবেগ নামক স্থানের দিকে আবু সুবিয়ানের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা জন্য প্রেরণ করলেন। এই জেহাদে হযরত সাদ আবি ওয়াক্কাস সর্ব প্রথম কাফেরদের উপর তীর নিক্ষেপ করেন। সেটাই প্রথম তীর যা ইসলামে কাফেরদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয় হিজরী

(কেবলা পরিবর্তন, গাযওয়াহ বদর সারিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ)

কেবলা পরিবর্তন ঃ এই বৎসর হতে ইসলামের জীবনে এক আযীমুশ্বান পরিবর্তন সাধিত হয় পৃথিবীর সর্ব প্রথম ঘর ও আদি মসজিদ। যার দিকে মানুষদেরকে এক মুখী হয়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে একাত্রিত করার জন্য একে মনোনিবেশের কেন্দ্র বানানো হয়েছে।

সারিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও ইসলামে প্রথম গনীমত

এই বৎসর রজব মাসে মহানবী (সাঃ) ১২ জন মুহজেরীনের দলপতি হিসাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) কে নির্বাচিত করে নাখলা নামক স্থানে কুরাইশদের একটি কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। যে দিবসে উভয়দল সামনাসামনি হল সে দিবসটি ছিল ১লা রজব। রজব হচ্ছে সেই চারটি নিষিদ্ধ মাসের একটি যাতে প্রথমতঃ ইসলামে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু

পার্শ্ব টিকাঃ ১। সীরাতে মোগল তাই ৪০ পৃঃ। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ২য় হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে উক্ত সারিয়াহ রওয়ানা হয়েছিল। অন্য বর্ণনায় আছে যে উক্ত সারিয়াহ্ গাযওয়াহ আবওয়াহর পরে প্রেরণ করা হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরাম ঐ তারিখকে জমাদিউস সানী মাসের ত্রিশ তারিখ বলে মনে করেছিলেন। যেমন লুবাবুন নুকুল এবং বায়যাভী শরীফে ইবনে জারীর তাবরানী ও বায়হাকী হতে যা বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যই পরামর্শের পর এ সিদ্ধান্ত হল যে, যুদ্ধ করতে হবে। পরিশেষে যুদ্ধ হল। কাফেরদের দলপতি নিহত হল এবং দুজন বন্দী হল, আর বাকীরা পালিয়ে গেল। অনেক গনীমতের মাল মুসলমানদের হাতে এল। মুহাজিরদের দলপতি সেগুলি বিতরণ করে দিলেন। এবং এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রেখে দিলেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, সমস্ত গনি মতের মালামাল নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হলে মহানবী (সাঃ) বললেন, আমি তোমাদের শাহরে হারাম অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধ করার নিষেধ প্রদান করিনি। পরিশেষে এই গনীমতের মালামাল তিনি বদর যুদ্ধ হতে ফিরে এসে মালেগণীমতের সাথে বন্টন করে দেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা আরব জাহানে রটেগেল যে, মহানবী (সাঃ) নিষেধ করা মাস সমূহে যুদ্ধ ও হত্যা কান্ড বৈধ করে দিয়ে-ছেন। এইসময় পবিত্র কোরআনের আয়াত– يسا لونك عن الشهرالحرام قتال فيه তাহাদের জওয়াবে নাযিল হয়।

গাযওয়াহ্ বদর

মদীনা শরীফ হতে ৮০ মাই দুরে একটি কুপের নাম বদর। বদর নামে একটি গ্রামের অবস্থান ও সেখানে রয়েছে। এই মহৎ জেহাদটি এ ময়দানেই সংঘটিত হয়েছিল। যার সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

কুরাইশদের গর্বাহংকার ও সমস্ত শক্তি সামর্থের কারণ যেহেতু শাম দেশের সহিত বানিজ্য সম্পর্কই ছিল প্রধান, সেহেতু রাজনৈতিক নীতি অনুযায়ী তাদের এই সম্পর্ক বন্ধ করে দেয়া অপরিহার্য ছিল। একবার কুরাইশদের এক বিরাট ব্যবসায়ী কাফেলা শাম হতে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কায় আগমন করছিল। মহানবী (সাঃ) এই সংবাদ পেয়ে ২য় হিজরীর ১২ই রমজানুল মোবারকে ৩১৪ জন মুহাজের ও আনসার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মোকাবেলার জন্য স্বয়ং গমন করলেন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি তাবু স্থাপন করেন (রওহা মদীনার দক্ষিণ দিকে ৪০ মাইল দুরে একটি স্থানের নাম)। এদিকে কুরাইশদের কাফেলা সর্দার এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র সে রাস্তা পরিহার করে কাফেলাসহ সমুদ্রের তীরে তীরে চলতে লাগলেন এবং সাথে সাথে একজন অশ্বারোহীকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন, যাতে কুরাইশগণ শুরু থেকেই মুসলমানদেরকে বিনাশ করা যায়। এই সংবাদ মক্কায় পৌছার সাথে সাথে ৯৫০ জন জোয়ানের একটি বড় দল যাদের মধ্যে ১০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ উট বিশিষ্ট বাহিনী মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হল। এই বাহিনীতে কুরাইশদের বড় নেতা এবং বিত্তশালী লোকদের প্রায় সবই ছিল।

সাহাবীগণের আত্মত্যাগ

কুরাইশদের এই সন্ত্রাসী বাহিনীর কথা মহানবী (সাঃ) এর গোচরীভূত হল, তখন তিনি পরামর্শের জন্য সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় বসলেন। হযরত আবু কবর সিদ্দিক (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাদের নিজস্ব জানমাল মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে পেশ করে দিলেন। উমায়ের ইবনে ওক্কাস (রাঃ) অল্পবয়স্ক হওয়ায় মহানবী (সাঃ) তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বারন করায় তিনি কাঁদতে লাগলেন। ফলে নবীজি তাকে অনুমতি প্রদান কররে তিনি যুদ্ধে শরীক হলেন। (কানযুল উম্মাল, ৫/২৭০ পৃষ্ঠা)

আনসারদের মধ্যে হতে খাযরাজ গোত্রের সরদার হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম। আপনি যদি হুকুম করেন তাহলে আমরা নদীতে ঝাপিয়ে পড়তে রাজী আছি। (সহীহ মুসলিম)

বোখারী শরীফ বর্ণিত আছে যে হযরত মেকদাদ (রাঃ) আযর করিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা আপনার ডাকে বামে সামনে পিছনে থেকে যুদ্ধ করব। এ কথা শুনে নবীজি (সাঃ) খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি তখন সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বদরের সন্নিকটে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, আবু সুফিয়ান তার ব্যবসায়ী কাফেলা সহ নিরাপদেই এখান থেকে চলে গেছে। তবে কুরাইশদের একটি বিরাটদল ময়দানেরই এক পার্শ্বে অবস্থান করছে। ব্যবসায়ী কাফেলাটি নিরাপদে চলে যাওয়ার পরও আবু জাহাল লোকদিগকে যুদ্ধ স্থগিত না রাখার পরামর্শ দিল।

মুসলমানদের বাহিনী কুরাইশদের তখন সংবাদ পেয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, কুরাইশরা প্রথমেই সেখানে পৌঁছে এমন স্থান দখল করে নিয়েছে যা যুদ্ধে জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পানির সকল ব্যবস্থাও সেদিকেই ছিল। মুসলমান বাহিনী এম শুষ্ক জায়গায় স্থান নিল যেখানে চলাফেরাই অসম্ভব ছিল। তদুপরি সেখানে পানির চিহ্ন ছিলনা।

গায়েবী সাহায্য

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো বিজয় ও সাহায্যের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তাই তিনি নিজ থেকেই এমন ব্যবস্থা করে দিলেন যে, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল। যার ফলে যমীনের বালূকা জমে শক্ত হয়ে গেল। মুসলিম সৈন্যগণ তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলেন এবং অন্যকে পান করালেন। পানির সকল পাত্র সমুহ ভরপুর করে রাখলেন। অপর দিকে এই বৃষ্টি কাফেরদের আবস্থান স্থল এমন পিচ্ছিল করে দিল যে, তাদের পক্ষে চলাফেরা করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। যখন দুই দল উভয়ে মুখোমুখি হল তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যোদ্ধাদের কাতার সোজা করাবার জন্য স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন। সুতরাং মুসলিম সৈন্যগণ মজবুত প্রাচীরের মত অনড় হয়ে দাঁড়াল।

মুসলমানদের ওয়াদা পুরণ

এ সময় যখন তিনশত নিরস্ত্র মানুষের মোকাবেলা এক হাজার সর্বশক্তি সম্পন্ন জোয়ান দের সহিত সংঘঠিত হতে যাচ্ছে, তখন যদি একটি লোকও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তবে তা এক বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে হবে। কিন্তু ইসলামে ওয়াদা পূরণ এই সকল কিছুর চাইতে অগ্রগণ্য। ঠিক যুদ্ধের মেইন সময়ে হযরত হোযায়ফা (রাঃ) ও হযরত আবু হাসান (রাঃ) নামে দুই সাহাবী জেহাদে অংশ নেয়ার জন্য এসে পৌছেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তারা রাস্তার ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন যে, " রাস্তায় আমাদেরকে কাফেরগণ পথ বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমরা কি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)– কে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছ? আমরা তা অস্বীকার করলাম এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবনা এই মর্মে ওয়াদা করে ফেলি।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন এ ব্যাপারটি জানতে পারলেন, তখন উভয় সাহাবীদেরকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "আমরা সর্বাবস্থায় ওয়াদা পূরণ করব। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলাই সাহায্য করবে এবং তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। (সহীহ মুসলিম)

মোট কথা মুসলিম সৈন্যদের সারি যখন সোজা হয়ে গেল, তখন সর্ব প্রথম কুরাইশদের তিন জন বাহাদুর এগিয়ে এল। মুসলমানদের মধ্যে থেকে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত হাম্যা (রাঃ) এবং হযরত উবায়দা ইবনে হারেস (রাঃ) তাদের মোকাবেলা করলেন। তিনজন কাফেরই নিহত হল। মুসলমানদের মধ্যে শুধু হযরত উবায়দা (রাঃ) আহত হলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাকে কাঁধে উঠিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে নিয়ে গেলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে নিজ রান মোবারকের সহিত ঠেস লাগিয়ে শুয়াইলেন এবং তার চেহারার ধুলিবালি নিজ হস্ত মোবারকে মুছে দিলেন। কবি কতইনা চমৎকার বলেছেন ঃ

دامن سی وہ یونجھتاهی اسو

رونی کاکجه اج هي مزاهی

মুছে দিল চোখ প্রিয় আঁচলে আপন

স্বাদ মোর আজই আছে কাঁদব যখন।

হযরত উবায়দা (রাঃ) শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আরয করলেন, "আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলাম?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, "না, বরং তুমি নিশ্চয় শহীদ এবং আমি স্বয়ং তাতে সাক্ষী। হযরত উবায়দা (রাঃ) আনন্দের সহিত বলতে লাগলেন যে, "যদি আজ আবু তালেব জীবিত থাকত তাহলে তাকে অবশ্যই একথা স্বীকার করতে হত যে, আমি তার কবিতার যোগ্যতম লোক(১)।

যখন উবায়দা (রাঃ) ইনতিকাল করলেন, তখন স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার কবরে নামলেন এবং নিজ হাতে তাঁকে দাফন করলেন। সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শুধু হযরত উবায়দা (রাঃ) এই বিশেষ মর্যাদার ভাগী হয়েছিলেন। (কানযুল উম্মাল দ্রঃ)

এজন্যই কবি বলেছেন–

بجه ناز رفتة باشد نه جهاد نياز مندي

كه بوقت جاد سيردن يرش رشيده باشي

"মরন লগ্নে চরণ তলে
মাথা রাখিবার ঠাই যেন পাই
কোথা আছে তার চেয়ে সুখ?
ভুলেছি যাতনা সকলই তাই।

সাহবাগণের আশ্চার্য জনক আত্মদ্যাগ

উভয় সৈন্যরা যখন পরস্পর সামনা সামনি হল, যখন দেখা গেল, নিজেদের অনেক কলিজার টুকরা আপনজন তরবারীর নীচে এসে গেছে। কিন্তু এই আল্লাহর দলের বিশ্বাস ছিল,

هزار خويش كه بيكانه ازخد باشد

فداى ايك تن بيكانه كاشناباشد

"হাযার আত্মীয় হয়ে গেছে আল্লাহ হতে পর
উৎসর্গ করি সে জন তরে প্রভুর ঘনিষ্টতর।

পার্শ্বটিকা ঃ ১। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু তালেব যিনি সর্বদা তার সাহায্য সহযোগিতায় তৎপর ছিলেন। তিনি নিজ সহযোগিতার প্রেরণা নিম্নবর্ণিত ছন্দগুলির মধ্যে বর্ণনা করেছেনঃ

كذبتم وبيت الله نبري محمدا × ولمالظاعن ونناضل

ونسلمه حتي نصرع حوله × ونزهلعن ابناء نا والحلانل

অর্থাৎ বায়তুল্লাহর শপথ, তোমাদের এই ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ যে, আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে দিব, যতক্ষন পর্যন্ত না আমাদের লাশ গুলি তার চারদিকে পড়ে থাকবে এবং আমরা আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তান গণকে ভুলে থাকব। (কানযুল উম্মাল ৫/২৭২ পৃঃ)

সুতরাং আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) পুত্র (যিনি তখন ও কাফের ছিলেন) যখন ময়দানে অবতীর্ণ হলেন, তখন স্বয়ং আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর তরবারী তার প্রতি উত্তোলন করা হল। উতবা সামনে আসবার সাথে সাথে তারই পুত্র হযরত হুযায়ফা (রাঃ) তরবারী উচিয়ে তার প্রতি আসলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এর মামা ময়দানে আসবার পর ফারুকী তরবারী স্বয়ং তার মীমাংসা করে দিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম ও ইসতিয়াব আঃ বার)

অতঃপর চরম ভাবে যুদ্ধ শুরু হল। এদিকে ময়দানের অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করল। ঐদিকে রাসূলগণের সরদার মহানবী (সাঃ) সিজদায় পড়ে দোয়া করতে লাগলেন। পরিশেষে গায়েবী সুসংবাদ তাকে আশ্বস্ত করে দিল।

আবু জাহেলের ধ্বংশ

যেহেতু আবু জাহলের দুষ্কর্ম ও ইসলামের দোষমনী সকলের চেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল। এজন্য আনসারদের মধ্য হতে হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত হযরত মুআজ (আঃ) দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন যে, যখন তারা আবু জাহেলকে দেখবে, তখন তাকে মারবেন নতুবা নিজেরা শহীদ হয়ে যাবেন। সুযোগ বুঝে দুই ভাই নিজেদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু তারা আবু জাহলকে না চিনবার দরুন হযরত আঃ রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আবু জাহেল কে? তিনি ইশারায় চিনিয়ে দিবার পর উভয়ে বাজ পাখির ন্যায় আবু জাহলের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। যার ফলে আবু জাহল রক্তমাখা অবস্থায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আবু জাহলের পুত্র ইকরামা (যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন।) পিছন হতে এসে হযরত মুআয (রাঃ) কে কাঁধের মধ্যে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। যার কারণে তার একটি বাহু কেটে গেল কিন্তু সামান্য চামড়া লেগে রইল। মুআয (আঃ) ইকরামাকে পিছনে পাল্টা ধাওয়া করলেন কিন্তু সে পালিয়ে গেল। অতঃপর মুআয (রাঃ) এই হালতেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কর্তিত হাতটি ঝুলে থাকায় যুদ্ধ করতে তার খুব অসুবিধা হচ্ছিল। কাজেই হাতটি পায়ের নীচে রাখলেন এবং সজোরে টান দিলে বাহুটি ছিড়ে যায়। অতঃপর তিনি পূর্বের ন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ। (সীরাতে হালরীর)

একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মো'জেযা

(একমুষ্টি মাটি দ্বারা সকল সৈন্যের পরাজয় ও ফেরেশতাদের সাহায্য)

যুদ্ধের চরম সময়ে মহানবী (সাঃ) আল্লাহর হুকুমে এক মুষ্টি মাটি দুশমন কাফের সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবীগণকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, একসঙ্গে কাফেরদের উপর ঝাপিয়ে পড়। এদিকে প্রকাশ্য ভাবে সামান্য সমরাস্ত্র নিয়ে সাহাবীগণ সামনে বাড়লেন আর অন্য দিকে আল্লাহ

তাআলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে নিজের সাহায্যের ওয়াদা পূর্ণ করলেন। কুরাইশদের বড় বড় সরদার যুদ্ধে নিহত হল এবং অন্যান্যরা পিছপা হয়েগেলে কাফেরদের কেহ কেহ নিহত হল এবং কেহ কেহ বন্দী হল। যাদের মধ্যে সত্তর জন নিহত আর সত্তর জন বন্দী হল। কুরাইশদের বড় বড় সরদার উত্‌বা, শাইবা, আবু জাহাল, উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ, উত্‌বা একে একে সবাই নিহত হল। এ দিকে মুসলমানদের মধ্যে শুধু ১৪ জন শহীদ হলেন। ৬ জন মুহাজের আর ৮ জন আনসার। এই গযওয়াহ মুলতঃ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ইসলামের প্রকাশ্য মোজেযাই ছিল। নতুবা তাতে মুসলমানদের বিজয় লাভ করার কোন প্রশ্নই ছিলনা। কেননা সে দিকে ছিল সহস্রাধিক জোয়ানের এক আযিমুশ্বান বিশাল বাহিনী আর এদিকে শুধু মাত্র ৩১৪ জন নিরস্ত্র মুসলমান। অন্য দিকে ছিল বড় বড় ধনাঢ্য ও বীত্তশালী সরদার মাতাব্বারগণ যারা একাই সকল সৈন্যদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল। আর এদিকে নিঃসম্ত্রল দরিদ্র লোকের ক্ষুদ্রজামাআত। সেই দিকে শতাধিক অশ্বারোহীর সমাবেশ আর অপর দিকে মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে মাত্র দুটি ঘোড়া। অপর দিকে সর্ব প্রকারের হাতিয়ারের বিপুল সমাবেশ আর এদিকে কয়েকটি তরবারী। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ দুশ্চিন্তা গ্রস্থ যে, এমনটি কি করে হতে পারে? কিন্তু তাদের জানা নেই যে, জয় পরাজয় সফলতা বা বিফলতা ঘোড়া তরবারী অথবা মাল ও দৌলতের নিয়ন্ত্রন রয়েছে কিন্তু এসব যাহেরী আসবাব পত্রে বিশ্বাসী এবং বিদ্যুৎ ও বাস্পের পূজারী দের এ হাকীকত বের করা কেমন করে সম্ভব? কবি আকবর এলাহাবাদী কত সুন্দর বলেছেন–

جهوزکربیٹها هی یورپ اسمانی باب کو–
بس خدا سمجهاهی اسنی برق کواوربهابکو ۱۲

ছেড়ে দিল ইউরোপ আজ উর্দ্ধ জগতের পিতাকে তার
বাস্প ও বিদ্যুৎ কে তারা আসন দিয়েছে খোদা তাআলার,

বদর যুদ্ধে বন্দীদের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার সভ্যতার দাবীদার উইরোপীয়দের জন্য শিক্ষা

বদর যুদ্ধ বন্দীরা যখন মদীনায় তাইয়্যেবায় পৌঁছল তখন মহানবী (সাঃ) তাহাদিগকে দুই দুই চার চার করে সাহাবাদের মধ্যে বন্দীদের বন্টন করে দিলেন। যার প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম তাহাদেরকে খানা খাওয়ানোর সুব্যবস্থা করতেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে সময় কাটাতেন। হযরত মাসআব ইবনে উমায়র (রাঃ) এর ভাই আবু আযীয ও যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমাকে যে আনসারী সাহাবীর নিকট

সোর্পদ করা হয়েছিল, তিনি খাওয়ার সময় হলে রুটি গুলি এনে আমার সামনে রাখতেন এবং নিজে মধু খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। (তাবারী দ্রঃ)

যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্ত হল যে, মুক্তিপনের মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। সুতরাং মাতা পিছু চার হাজার দিরহাম মুক্তিপন নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল।

ইসলামী সাম্য

যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে মহানবী (সাঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) ও ছিলেন। (তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন)। হযরত আব্বাস (রাঃ) রাতের বেলায় বন্দী দশার কারণে কষ্টে বিরক্তিভাব পোষণ করছিলেন। তার যন্ত্রনা কাতর আওয়ায মহানবী (সাঃ) এর কানে পৌঁছলে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায়। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার নিদ্রা আসছেনা কেন? মহানবী (সাঃ) বললেন, আমি কি করে ঘুমাব, যেখানে আমার সম্মানীত চাচার যন্ত্রনাকাতর আওয়াজ আমার কানে আসছে। (কানযুল উম্মাল ৫/২৭২ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ইসলামের সাম্য এ অনুমতি প্রদান করে না যে তার সম্মানিত বয়স বৃদ্ধ চাচাকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি দিবেন অন্যান্যদের কাছে থেকে যেভাবে মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে তার কাছে থেকে ও নেওয়া হল বরং সাধারণ বন্দীদের থেকে বেশী নেওয়া হয়েছে। কেননা সাধারন বন্দীদের থেকে চার হাজার এবং নেতৃবর্গের কাছ থেকে আরও কিছু বেশী নেয়া হয়েছিল হযরত আব্বাস (রাঃ) ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাই তাকে চার হাজার দিরহামের চেয়ে বেশী দিতে হয়েছিল। হযরত আব্বাস এর মুক্তিপণ মাফ করে দেওয়ার জন্যও আনসারগণ আবদার পেশ করেছিলেন। কিন্তু ইসলামের সাম্যে আত্মীয় অনাত্মীয় দোসত দুশমন সবাই সমান ছিল। আনসারগণের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তা কবুল হয়নি। এমনিভাবে মহানবী (সাঃ) এর জামাতা আবুল আসও বদরের যুদ্ধ বন্দী হিসাবে আনিত হয়েছিল। তার নিকট মুক্তিপন দিবার মত সম্পদ ছিলনা। এজন্য তার স্ত্রী অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এর কন্যা হযরত যয়নব (রাঃ আনহা) কে (যিনি মক্কায় বসবাস করতেন) মুক্তিপন যোগাড় করে পাঠাবার জন্য বলে পাঠালেন। বিবি যয়নবের গলায় একটি হার ছিল যা তার মাতা হযরত খাদীজা (রাঃ-আনহা) তাকে বিবাহের সময় প্রদান করেছিলেন। তাই মুক্তিপণ হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন। মহানবী (সাঃ) যখন উক্ত হারটি দেখলেন, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার চোখ থেকে পানি আসতে লাগল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলিলেন, যদি তোমরা রাযী থাক তাহলে যয়নবের নিকট তার মায়ের স্মৃতি এই হার ফেরত পাঠিয়ে দাও। সাহাবাগণ সানন্দে রাযী হয়ে উক্ত হারখানা ফেরত পাঠালেন। আবুল আসকে বলে দিলেন যে, হযরত যয়নবকে যেন মদীনায় পাঠিয়ে দেন। (মেশকাত ৩৪৬ পৃঃ)

আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ

আবুল আস মুক্তি লাভ করে মক্কায় পৌঁছলেন এবং শর্ত মত হযরত যয়নব (রাঃ-আনহা) কে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আস একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়বার আবার শাম (সিরিয়া) হতে ব্যবসার মালামাল নিয়ে আসার সময় গ্রেপতার হলেন এবং এমনিভাবে মুক্তি লাভ করলেন। এবার রেহাই পেয়ে মক্কায় ফিরে এসে সকল অংশীদারদের সাথে হিসাব কিতাব পরিসমাপ্ত করে ফেললেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর লোকদেরকে বললেন, "আমি এখানে এসে এজন্যই মুসলমান হলাম যাতে লোকেরা একথা বলতে না পারে যে, আবুল আস আমাদের মাল সম্পদ আত্মসাৎ করে তাগাদার ভয়ে মুসলমান হয়ে গেছে অথবা তাকে জোর পূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে।" —(তারিখে তাবারী দ্রঃ)

বদরের যুদ্ধ বন্দীদের নিকট পরিধানের কোন কাপড় ছিলনা। তাই, মহানবী (সাঃ) সকলের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রাঃ) এই পরিমাণ লম্বা আকৃতির ছিলেন যে, কারো জামা তার শরীরে ঠিকভাবে লাগছিল না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক সরদা) তার জামাটা তাকে দিয়ে দিলেন। মহানবী (সাঃ) আপন জামা যা পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দিয়েছিলেন, তা সেই উপকারের প্রতিদান হিসাবে অনেকটা বিবেচ্য ছিল। —(বোখারী)

ইসলামী রাজনীতি ও শিক্ষার উন্নতি

বদরের যুদ্ধে যে সমস্ত বন্দী মুক্তিপণ দিতে অপরাগ ছিল তাদের মধ্যে যারা লেখা পড়া জানত তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা দশ জন দশ জন করে ছেলে মেয়েদেরকে লেখা পড়া শিখিয়ে দাও। এটাই তোমাদের মুক্তিপণ। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) এভাবেই লেখা পড়া শিখেছিলেন।

এ বৎসরের বিভিন্ন ঘটনাবলী

এ বৎসরে রবিবার দিন যখন মহানবী (সাঃ) বদরের যুদ্ধে থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন লোকজন তার কন্যা হযরত রুকাইয়া (রাঃ-আনহা) এর দাফন কাজ শেষ করে হাত পা পরিষ্কার করছিলেন। (সীরাতে মোগলতাই ৪৫ পৃঃ)

বদরের যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর এ বৎসরেই সর্বপ্রথম ঈদুল ফেতর এবং যাকাতও এ বৎসরেই ওয়াজিব হয়। ঈদুল আযহার নামায এবং কোরবানী ও এই বৎসরই ওয়াজিব হয়। এ বৎসরই যিলহজ্জ মাসে হযরত ফাতেমা (রাঃ-আনহা) এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। —(মোগলতাঈ)

তৃতীয় হিজরী
(ওহুদের যুদ্ধ ও গাত্‌ফান প্রভৃতি)
গাতফান যুদ্ধ এবং নবীজির সুমহান চরিত্রের মো'জেযা

তৃতীয় হিজরীতে দাসূর ইবনে হারেস মুহারিবী চারশত পঞ্চাশ জন সৈন্যসহ মদীনা তাইয়্যেবা আক্রমণ করার জন্য রওয়ানা হল। মহানবী (সাঃ) তাঁর মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলে সকলেই পালিয়ে এক পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। মহানবী (সাঃ) নিশ্চিন্তে ময়দান হতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময় ঘটনাক্রমে বৃষ্টিতে তার কাপড় চোপড় ভিজে যায়। তিনি এগুলি শুকানোর জন্য একটি গাছের উপর ছড়িয়ে দিলেন এবং নিজে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। ঐ দিকে দাসুর ইবনে হারেস মুহারিবী পাহাড়ের উপর হতে তা অবলোকন করছিল। সে যখন দেখল, মহানবী (সাঃ) নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ছেন তখন সে সোজাসুজি তাঁর মাথার নিকটে এসে উপস্থিত হল এবং তরবারী উচিয়ে বলতে লাগল, বল আমার হাত থেকে তোমাকে এখন কে রক্ষা করবে? কিন্তু প্রতিপক্ষ ছিলেন রাসূলে খোদা (সাঃ) । নির্ভয়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন। কথাটি শুনামাত্র দাসুরের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হল এবং তরবারীটি মাটিতে পড়ে গেল। তখন মহানবী (সাঃ) তরবারীটি হাতে উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন তুমি বল, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? কেউনা বলা ছাড়া তার কাছে আর জবাব ছিলনা। মহানবী (সাঃ) তার এই করুন অবস্থা দেখে বিগলিত হয়ে দয়ায় গলে গেলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ ৪৯ পৃঃ)

দাসুর তখন থেকে এই প্রতিক্রিয়া নিয়ে উঠল যে সেশুধু নিজেই মুসলমান হন নাই, বরং নিজ গোত্রে যেয়ে ইসলামের একজন শক্তিশালী প্রচারকে পরিণত হলেন।(১)

دل مین سماکی هین قیامت کي شوخيان

دوجار دن رهی تهی کسي کي نگاه مین

"অন্তরে অনল জ্বলিছে হেতু কিয়ামতের ক্ষত

দু'চার দিবস পড়েছিল কাহারো চোখের জ্যোতি"।

পার্শ্বটিকা ঃ (১) বাদুরের মত চোখ দিয়ে অবলোকন কারী প্রতিবাদী ইউরোপীয় জাতি চক্ষুমেলে দেখুক যে, ইসলাম প্রচারের কারণই উত্তম চরিত্র না কি তরবারীর শক্তি, না কি সম্পদের লোভ।

হযরত হাফসা ও যয়নাবের সাথে নবীজীর (সাঃ) বিবাহ

মহানবী (সাঃ) তৃতীয় হিজরী সনে শাবান মাসে উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফসার সাথে এবং একই সনে হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মার সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। (মোগলতাঈ)

ওহুদের যুদ্ধ

ওহুদ মদীনা শরীফের নিকটবর্তী একটি পাহাড়। যেখানে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে হযরত হারুন (আঃ) এর কবর শরীফ অবস্থিত জমহুর মোদ্দেসীরগণের ঐক্যমতে ওহুদের যুদ্ধটি তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক গণের মতে এর তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। যেমন ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ইত্যাদি। (যুরকানী শরহে মাওয়াহিব ২/২০ পৃঃ)

বদরের যুদ্ধে পরাজিত মুশরিকগণ এক বৎসর পর যদিও কিছু শোক কাটিয়ে উঠল কিন্তু প্রতিশোধের আগুন প্রচন্ড ভাবে সর্বদা তাদের অন্তর জ্বলছিল। মদীনা তাইয়্যেবা আক্রমণ করার ইচ্ছায় তারা তিন হাজার সৈন্যের সজ্জিত বাহিনী মদীনা তাইয়্যেবার দিকে অগ্রসর হল। যাদের মধ্যে সাতশত বর্ম, দুইশত ঘোড়া তিন হাজার উট পর্যন্ত ছিল। চৌদ্দ জন মহিলাকেও তারা এই উদ্দেশ্যে সঙ্গে এনেছিল যে তারা পুরুষদের কে অবজ্ঞা করবে এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় লানত করবে। এদিকে মহানবী (সাঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) মুসলমান হয়েও তখন পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করছিল। তিনি অতিসত্বর সমস্ত ঘটনাবলী কাগজে লিখে একজন দ্রুতগামী বাহক কে মহানবী (সাঃ) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সংবাদ পাওয়ার পর দ্রুত দুইজন লোক আগে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাপারটি অনুসন্ধান করার জন্য। তারা এসে সংবাদ দিল যে কুরাইশদের সন্ত্রাসী বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছেছে। শহরের উপর হামলা করার সন্দেহ থাকার কারণে তার চারদিকে পাহারার ব্যবস্থা করা হল। রাত প্রভাত হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার পর এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার বাহিরে আগমন করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মোলাফেবা সরদা) ও তাহার সমমনা তিনশত মোনাফেক নিয়ে এই মুসলিম সৈন্যের কাফেলায় শামিল হয়েছিল। কিন্তু তারা সকলে রাস্তা থেকে ফিরে গেল। এবার মুসলমানের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র সাতশত।

সৈন্যদের শৃংখলা ও বালকদের যুদ্ধের আগ্রহ

মদীনার বাইরে এসে সৈন্যদের হিসাব পরীক্ষা করা হল তখন অল্প বয়স্ক বালকদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে জেহাদের এমন প্রবল আগ্রহ ছিল যে রাফে ইবনে খাদীজাকে যখন বলা হল তোমার অল্প বয়স তুমি ফিরে যাও। তখন তিনি পায়ের পাতার উপর ভর করে উঁকি দিয়ে দাড়ালেন যেন তাকে উঁচু মনে হয়। সুতরাং তাকে জেহাদে নিয়ে যাওয়া হল। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব তারই সমবয়স্ক ছিল। তিনি যখন উক্ত ঘটনা দেখলেন তখন আমি তো রাফে ইবনে খাদীজকে কুস্তি করে ধরাশায়ী করে ফেলতে পারব। যদি তাকে জেহাদে নেয়া হয় তবে আমাকে তো আরো উত্তম কারণে নিয়ে যাওয়া উচিত। কথামত উভয়কে কুস্তিতে লাগিয়ে দেয়া হল। সামুরা রাফেকে ধারাশায়ী করে দিল। পরিশেষে তাকে জেহাদের নিয়ে যাওয়া হল।

(তারীখে তাবারী ৩য় খন্ড)

ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে একথা যারা বলে তারা কি এই আত্মত্যাগ দেখে নিজেদের মিথ্যা প্রপাগণ্ডার জন্য লজ্জিত হবে না? সার কথা রণাঙ্গনে পৌঁছে মহানবী (সাঃ) সৈন্যদের কাতার বিন্যাস করলেন। পশ্চাতে ছিল ওহুদ পাহাড়। এজন্য সেদিক থেকে দুশমনদের হামলা করা সন্দেহ ছিল। মহানবী (সাঃ) তাই পঞ্চাশ জন সৈন্যকে এদিক পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং বললেন মুসলমনাদের বিজয় কি পরাজয় যাই হউক তোমরা এখান হতে সরতে পারবে না। জেহাদ শুরু হল। দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর কাফের সৈন্যরা যখন পিছপা হতে লাগল তখন মুসলমানদের অবস্থান ভাল দেখা যাচ্ছিল। কুরাইশরা স্তম্ভিত অবস্থায় বিভিন্ন দিকে বিক্ষপ্ত হয়ে পড়ল। মুসলমান সৈন্যরা গণীমতের মাল সঞ্চয় করতে লাগল। এ অবস্থা দেখার পর ঐ সৈন্যগণ ও আপন স্থান হতে এখানে আসতে লাগল। যাদেরকে মহানবী (সাঃ) পাহাড়ে পাহারার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর বহুবার নিষেধ করলেন কিন্তু তারা এখানে আর পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন নেই মনে করে এখান থেকে চলে গেলেন। এখানে মাত্র কয়েকজন সৈন্য রয়ে গেলেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ যিনি তখনও মুসলমান হননি, পিছন দিকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং তার কতিপয় সাথীরা জীবন উৎসর্গ করে প্রচণ্ড ভাবে মোকাবেলা করলেন। রাস্তা পরিষ্কার হল। খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তার সৈন্য নিয়ে

মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবং মুসলমানগণ স্বয়ং মুসলমানদের হাতে শহীদ হতে লাগলেন। মাসআব ইবনে উমায়ের শাহাদাত বরণ করলেন। তার চেহারা যেহেতু মহানবী (সাঃ) এর সাথে কিছু মিল ছিল তাই তার শাহাদাতের পর এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে মহানবী (সাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, কোন শয়তান অথবা কোন মুশরেক উচ্চ আওয়াজ বলছিল যে মুহাম্মদ (সাঃ) নিহত হয়েছেন।

(যুরকানী শরহে মাওয়াহিব ২/৩৩ পৃঃ)

এই সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়িল। বড় বড় বাহাদুর সৈনিকের পা দুর্বল হয়ে গেল কিন্তু সবার দৃষ্টি তখন ঐ কাবায়ে মাকসুদ অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) কে উৎসুকভাবে তালাশ করছি। সর্ব প্রথম হযরত ইবনে মালেক (রাঃ) এর দৃষ্টি মহানবী (সাঃ) এর উপর পতিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দে বলে উঠলেন যে মোবারক হউক মহানবী (সাঃ) সুস্থ আছেন এবং নিরাপদেই এখানে আছেন। সংবাদটি শুনামাত্রই সাহাবাগণ দৌড়ে নবীজির (সাঃ) দিকে আসতে লাগলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাফেরগণও সকল দিকে হতে সরে এদিকেই আক্রমণ শুরু করল। কাফেররা হুজুর (সাঃ) আক্রমণ করল কিন্তু তবুও তিনি নিরাপদেরই রইলেন। একবার কাফেররা চাপসৃষ্টি করল। তখন মহানবী (সাঃ) বললেন, কে আছ আমার জন্য জীবন দিতে? হযরত যিয়াদ ইবনে সাকান (রাঃ) চারজন সাহাবী নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং জীবন উৎসর্গ করে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। যখন যিয়াদ আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন তখন মহানবী (সাঃ) বলিলেন তার লাশ আমার নিকটে নিয়ে আস। লোকেরা তার নিকটে নিয়ে আসলেন। তখন পর্যন্ত তার দেহ প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। তিনি মহানবী (সাঃ) এর কদমে মুখ রাখলেন এবং এই হালাতেই প্রাণ ত্যাগ করলেন। সুবহানাল্লাহ্!

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আলোকময় চেহারা আহত হওয়া

কুরাইশদে প্রসিদ্ধ বাহাদুর আব্দুল্লাহ্ ইবনে কামাইয়া কাতার ভঙ্গ করে সামনে এল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র চেহারা মুবারকের উপর রবারী দ্বারা আঘাত করল। যদ্দ্বারা শিরস্ত্রানের দুইটি কড়া তাঁর চেহারা মুবারকের মধ্যে প্রবেশ করল এবং একখানা দান্দান মোবারক শহীদ হয়ে গেলে। হযরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) সেই কড়াদ্বয় খুলবার জন্য অগ্রসর

হইলেন। এমনি সময় হযরত আবু উমাইয়া (রাঃ) কে বললেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই খেদমটুকু করার সুযোগ দিন"। একথা বলে সামনে অগ্রসর হয়ে হাতের বদলায় মুখের দ্বারা কড়াগুলিতে কামড় দিয়ে সজোরে টান দিলেন। প্রথমাবস্থায় একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তা দেখে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) দ্বিতীয় কড়াটি খুলার জন্য অগ্রসর হতে চাইলেন। আবু উবাইদা এবারও কসম দিয়ে তাঁকে বারণ করলেন এবং নিজেই দ্বিতীয় বার এমনিভাবে মুখের দ্বারা অন্য কড়াটি বের করলেন। এবারও তাঁর আরেকটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। (ইবনে হাব্বান, তাবরানী ও দারে কুত্‌নী ইত্যাদি, কান্‌য ৫/২৭৪)

কাফেররা মুসলমানদের জন্য কয়েকটি গর্ত তৈরী করে রেখে ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এগুলোর একটির মধ্যে পড়ে গেলেন।

সাহাবায়ে কেরামের আত্মত্যাগ

এই অবস্থা দেখার পর সাহাবাগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চারদিকে বেষ্টন করে দাঁড়ালেন। তীর ও তরবারীর যে বৃষ্টি হচ্ছিল সেগুলি সাহাবাগণ নিজেদের শরীরে গ্রহণ করতে লাগলেন। হযরত আবু দাজানা (রাঃ) নিজেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঢাল বানিয়ে ফেললেন। যে সকল তীর আসত উহা তাঁর পিঠের উপর পিতত হত। হযরত তাল্‌হা (রাঃ) তীর ও তরবারীর আঘাতগুলিকে নিজের শরীরের দ্বারা প্রতিহত করছিলেন। যার ফলে, তাঁর একটি হাত কাটিয়া আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। যুদ্ধের পর দেখা গেল তাঁর শরীরে সর্বমোট সত্তরটি বেশী যখম রয়েছে।

(ইবনে হাব্বান ইত্যাদি কান্‌য ৫/২৭৮পৃঃ)

হযরত আবু তালহা (রাঃ) একটি ঢালের দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীর মুবারকের হেফাজতের কাজ করছিলেন, তখন আবু তাল্‌হা (রাঃ) বলে উঠলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঘাড় উত্তোলন করবেন না। আপনার উপর যেন শত্রু বাহিনীর কোন তীর না লাগে। এই জন্য আপনার পূর্বে আমার সিনা প্রস্তুত রয়েছে।" (বোখারী)

একজন সাহাবী আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি নিহত হয়ে যাই তাহলে আমার ঠিকানা কোথায় হবেঃ তিনি বললেন, "জান্নাতঃ। সাহাবী কিছু খেজুর হাতে নিয়ে খেতেছিলেন। একথা শুনামাত্রই এগুলি নিক্ষেপ করে সোজা রণাঙ্গাণে চলে গেলেন। পরিশেষে, যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন। (বোখারী, গাযওয়াহ্‌-এ ওহুদ)

কুরাইশ হতভাগাগণ নির্দয় ভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর তরবারী নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু রাহমাতু-ল্লিল আলামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যবান মুবারক হতে এই কথাই বের হচ্ছিল।

اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون–

অর্থাৎ "আয় আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে মাফ করে দিন; তারা যেহেতু অজ্ঞ।" (ফতহুলবারী পারা নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৪৮, গাযওয়াহ্ ওহুদ দ্রঃ)

তাঁর চেহারা মুবারক হতে রক্ত ঝরছিল এবং করুণার নবী এগুলি কোন কাপড় ইত্যাদি দ্বারা মুছে নিচ্ছিলেন আর বলছিলেন "যদি এক ফোটা রক্ত এযমীনে পতিত হত তাহলে সকলের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়ে যেত।" (ফতহুল বারী, গাযওয়াহ্ ওহুদ দ্রঃ)

এ যুদ্ধে কাফেরদের মাত্র বাইশ বা তেইশ জন নিহত হয় এবং সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন।

হিজরী সন চতুর্থ

বীরে মাউনার দিকে সারিয়া-এ-মুন্‌যির

এ বৎসর সফর মাসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সত্তর জন সাহাবা একদলকে নজ্‌দ অভিমুখে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠালেন। এদলে বড় বড় আলেম সাহাবা ও সামিল ছিলেন। সেখানে তারা পৌঁছিবার পর আমের, রাল্‌ যাকওয়াল, ওসাইয়া প্রভৃতি গোত্র তাদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরী হল। সর্বশেষে যুদ্ধ হল। তাদের সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাতে খুবই দুঃখিত হলেন। এমনকি তিনি তাদের হত্যাকারীদের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত ফরয নামাযে বদদোয়া করলেন।

(সীরাতে মোগলতাঈ, ৫২ পৃঃ)

এ বৎসরই হযরত হাসান (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করলেন এবং হযরত উম্মে সাল্‌মা (রাঃ আন্‌হা) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

হিজরী সন পঞ্চম
(কুরাইশ ও ইহুদী সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও আহ্যাবের যুদ্ধ)
কুরাইশ ও ইহুদীদের একাত্মতা

মহানবী (সাঃ) মদীনা তাইয়েবায় এসে এখানকার ইহুদীদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করলেন। সর্বদা তিনি এই চুক্তিকে রক্ষা করে আসছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইহুদীরা মদীনা তাইয়্যেবার সরদার এবং বড় শীর্ষস্থানীয় হিসাবে গণ্য ছিল, তাই মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় আগমন করার পর ইসলামের দৈনন্দিন উন্নতি দেখে তাদের খুবই হিংসার সৃষ্টি হত। তাই তারা সব সময় মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদের ক্ষতির চিন্তায় লেগে থাকত।

বদরের যুদ্ধে মুসলমনাদের আশ্চর্য জনক বিজয় লাভ করায় ইহুদীদের হিংসা ও রাগের অন্ত ছিলনা। শেষ পর্যন্ত তারাই প্রকাশ্যে চুক্তি ভঙ্গ শুরু করে দিল। সুতরাং দ্বিতীয় হিজরীতে তাদের গোত্র বনি কায়নুকা যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর পর বনি নযীর বিদ্রোহ শুরু করল। এ অবস্থা অবলোকন করার পর মহানবী (সাঃ) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। অতঃপর যুদ্ধ হওয়ার পর তারা গৃহবন্দী হয়ে পড়ল। কিছুদিন পর্যন্ত এভাবে অবরুদ্ধ থাকার পর দেশ থেকে বহিষ্কার হয়ে বনি কায়নুকা শাম এলাকায় এবং বনি নযীর খাইবার এবং অন্যান্য স্থানে চলে যায়।

এ দিকে মক্কার কুরাইশরা প্রথম থেকেই সেখানকার ইহুদী ও মুনাফিকদের চিঠি পত্রের মাধ্যমেই শুধু বিরোধিতার ইন্ধন যোগাচ্ছিল না বরং হুমকি ও দিয়েছিল যে যদি তোমরা মহানবী (সাঃ) কে এখান থেকে বহিষ্কার না কর তাহলে আমরা তোমাদের সাথেও যুদ্ধ করব। (আবু দাউদ)

এ সময় উপরোক্ত কারণগুলিই পরস্পরে ঐক্য ও একমত হওয়ার কাজ করল। এই সুযোগে মক্কার কুরাইশ মদীনার ইহুদী এবং মুনাফেকদের সম্মিলিত শক্তি ইসলাম বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত মস্ত গোত্রে এক অগ্নি জ্বলে উঠল। সুতরাং পঞ্চম হিজরীর দশই মুহাররাম তারিখে অনুষ্ঠিত "যাতুররেকা" এর যুদ্ধটি ছিল এই ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি। তারপর পঞ্চম হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত "দুমাতুল জান্দাল" এই ধারারই আরেকটি ঘটনা। পঞ্চম হিজরী সনের ২রা শাবান তারিখে সংঘটিত গাযওয়াহ্ বনি মুস্তালেকও ছিল এই সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য স্বাক্ষর। এই ষড়যন্ত্র দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নানা ভাবে চলতে লাগল।

আহযাবের যুদ্ধ তথা খন্দকরে যুদ্ধ

পরিশেষে পঞ্চম হিজরীর যিল্-কা'দ মাসে কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং দশ হাজার সৈন্যর একটি সশস্ত্র বাহিনী মদীনায় দিকে অগ্রসর হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই সংবাদ পেয়ে সাহাবীদেরকে নিয়ে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, ময়দানের পিছনে যুদ্ধ করা সমীচিন হবে না বরং মদীনার যে দিক হতে শত্রু সেনারা প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে সে দিক দিয়ে পরিখা খনন করা হউক। সুতরাং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তিন হাজার সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে খাল খনন করার জন্য নিজেই প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ছয় দিনের মধ্যেই দশ হাত গভীর খাল খনন হয়ে গেল। খনন কার্যে স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হস্ত মোবারকের এক অনন্য ভূমিকা ছিল। (সীরাতে মোগলতাঈ ৫৬ পৃষ্ঠা ৫৬)

একদিন খাল খনন করার সময় একটি পাথর খন্ড বেরিয়ে এল যার ফলে, খাল খনন করতে সকলেই অপরাগ হয়ে গেলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের হস্ত মোবারকে একটি কোদাল মেরে দিলেন। ফলে টুকরা টুকরা হয়ে উড়ে গেল। মোট কথা, খাল খনন শেষ হয়ে গেল।

এ দিকে কাফের কুলের সৈন্য বাহিনীরা এসে উপস্থিত হয়ে গেল এবং চারদিকে মদীনা ঘেরাও করল। আনুমানিক পনর দিন পর্যন্ত মুসলমান গণ অবরোধ অবস্থায় ছিলেন। এই সময়ে ইহুদীদের অবশিষ্ট কবিলা বনু কুরাইযাও চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের দলে প্রবেশ করে তাদের দল বৃদ্ধি করে অরোধের কারণে মদীনায় শক্ত অস্থিরতা দেখা দেয়। খাদ্য শস্যের স্বল্পতার দরুন সাহাবাগণের পালাক্রমে তিন দিন পর্যন্ত অনাহার থাকতে হল।

একদিন ক্ষুদার জ্বালায় অস্থির হয়ে সাহাবাগণ নিজেদের পেট খুলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখালেন যে, তাদের সকলের পেটেই পাথর বাঁধা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের পেট খুলিয়া দেখালেন তার পেটে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

এদিকে অবরোধকারীরা যখন পরিখা অতিক্রম করতে অপরাগ হয়ে গেল তখন ঐখান থেকেই তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু করলো। উভয় পক্ষে থেকে তীর বিনিময় চলতে লাগল। এ অবস্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়।

কাফেরদের উপর ঝড় তুফান ও আল্লাহর সাহায্য

সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলা এই সম্বলহীন জামআত কে সাহায্য করলেন এবং কাফের বাহিনীর উপর এমন প্রবল ঝড় তুফান প্রেরণ করলেন যে, তাদের তাবুর খুঁটিগুলো উপড়িয়ে গেল, চুলার উপর হতে হাড়ি পাতিল গুলো উল্টিয়ে গেল। যদ্দারা কাফের বাহিনীর অবরোধ অকেজু হয়ে গেল। এ দিকে হযরত নাঈম ইবনে মাসউদ (রাঃ) এমন এক কৌশল অবলম্বন করলেন যার দ্বারা তাদের সৈন্যদের মধ্যে ফাটল দেখা দিল। মোটকথা, এমন কতকগুলো কারণ একত্রিত হল যে, কাফের বাহিনীর পা উৎপাটিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

বিভিন্ন ঘটনা সমূহ

এ বৎসর হজ্জ ফরয হয়েছে। তবে এর তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এই বৎসর জামাদিউল আওয়াল মাসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাতি আবদুল্লাহ ইবনে উসমান (রাঃ) অর্থাৎ হযরত রুকাইয়া (রাঃ) আনহানর পুত্র ইন্তিকাল করেন। শাওয়াল মাসের শেষদিকে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর আম্মাজান ইন্তিকাল করেন। এ বৎসরই যিল্ কা'দা মাসে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ আনহা) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে পরিণত সূত্রে আবদ্ধ হন। এ বৎসরই মদীনায় ভূমিকম্প এবং চন্দ্র গ্রহণ হয়েছিল। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৫)

হিজরী সন ৬ষ্ঠ

(হুদাইবিয়ার সন্ধি, বাইআতে রিযওয়ান, দুনিয়ার রাজন্যবর্গদের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত)

যিল কাদার শুরুতেই উপরুক্ত হিজরীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় সফরের ইচ্ছা পোষণ করলেন। অতঃপর তিনি উমরার জন্য এহরাম বাঁধলেন। প্রায় চৌদ্দ থেকে পনের শত সাহাবী তার সফর সঙ্গী হলেন। (মোগলতাঈ দ্রঃ)

হুদাইবিয়া হতে এক মানযিল দুরে একটি কূপ। এরই নামানুসারে গ্রামের নাম হুদাইবিয়া বলে প্রসিদ্ধ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এখানে পৌছে যাত্রা বিরতি করেন।

সেথায় শুকনা একটি কূপ ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মো'জেযায় তাতে পানি ভরপুর হয়ে গেল।

হুদাইবিয়ায় পৌঁছে তিনি হযরত উসমান গণি (রাঃ) কে মক্কায় এই মর্মে পাঠালেন যে, কুরাইশগণকে অবগত করে দাও যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবার কেবল বাইতুল্লাহর যিয়ারত ও ওমরা পালন করার জন্য আগমন করেছেন। তা ছাড়া তার আর কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। হযরত উসমান গণি (রাঃ) মক্কায় পৌঁছিলে তাকে কাফেরগণ আটকিয়ে রাখে। এই সংবাদ এভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, কাফেরেরা হযরত উসমান (রাঃ) কে হত্যা করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল। তখন তিনি একটি বাবলা গাছের নীচে বসে সাহাবাগণ হতে জেহাদের অঙ্গিকার গ্রহণ করলেন। পবিত্র কুরআনে এর বর্ণনা রয়েছে এবং একেই বাইয়াতে রিযওয়ান বলা হয়।

পরে জানাগেল যে, সংবাদটি ভূয়া বরং কুরাইশরা সোহাইল ইবনে আমরকে সন্ধির শর্তগুলো ঠিক করবার জন্য প্রেরণ করল। নিম্ন বর্ণিত শর্তগুলো ঠিক করবার পর অঙ্গিকার নামা লেখা হল। দশ বৎসরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি অনুষ্ঠিত হল।

১। মুসলমানগণ এবার হজ্জ না করে ফিরে যাবেন।

২। আগামী বৎসর মাত্র তিন দিন থেকে চলে যাবেন।

৩। হাতিয়ারের দ্বারা সু-সজ্জিত অবস্থায় আসতে পাবেন না। তরবারী সাথে থাকলে কোষ বন্ধ করে আনবেন।

৪। মক্কা হতে কোন মুসলমানকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।

৫। যদি কোন মুসলমান মক্কায় থাকতে চান তবে তাদেরকে বাঁধা দিতে পারবেন না।

৬। মদীনা থেকে কোন লোক মক্কায় চলে আসলে কুরাইশরা তাকে মদীনায় ফেরত পাঠাবে না ইত্যাদি।

এ সকল শর্তাবলী যদিও মুসলমানদের জন্য হানিকর ছিল এবং বাহ্যত ইহা পরাজয় মূলক ছিল কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইহার নাম "মহান বিজয়" রাখলেন। এ সফরেই সূরা ফাতাহ অবতীর্ণ হয়। এভাবে বশীভূত হয়ে সন্ধি

করাটা সাহাবাগণ সহজে মেনে নিতে অপছন্দ করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বারং বার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে এধরনের সন্ধি মেনে না নিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, ইহাই আমার প্রতি আল্লাহর হুকুম এবং তাতেই আগামী দিনের কল্যাণ নিহিত আছে। সুতরাং পরবর্তী ঘটনাসমূহ এই সমস্যাকে সমাধান করে দেয়। কেননা এই সন্ধির বদৌলতে নিরাপদ ভাবেই মক্কা হতে মদীনায় যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। এদিকে ইসলামী চরিত্রের আকর্ষণীয় প্রচেষ্টা তাদেরকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুযায়ী এ বৎসর এত বেশী লোক ইসলামে প্রবেশ করল যে, অতীতে কোন দিন এত বেশী লোক ইসলামে প্রবেশ করেনি। মূলতঃ এই সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়ের ভিত্তি।

দুনিয়ার রাজা বাদশাদের প্রতি পত্র মারফত দাওয়াত

যখন উল্লেখিত সন্ধির দ্বারা দাওয়াতের পথ নিষ্কন্টক হলো, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই সত্যের আওয়াজ সারা পৃথিবীর রাজা বাদশাহর নিকট পৌঁছে দিবার ইচ্ছা পোষণ করলেন।

সুতরাং আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) কে নাজ্জাসী আসহামার নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পত্রটিকে দুই নয়নের মধ্যে রাখলেন এবং সিংহাসন হতে নেমে মাটিতে বসে গেলেন। পরক্ষণেই মনের খুশিতেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হায়াতে তাইয়্যেবায়ই তার ইন্‌তিকাল হয়েছিল।

হযরত দাহ্‌ইয়া কাল্‌বী (রাঃ) কে রোমের বাদশাহ্ হেরাক্‌লার নিকট পাঠান হল। অতীতের আসমানী কিতাব সমূহের দ্বারা এবং অকাট্য দলিলাদির দ্বারা তার নিকট একথা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য পয়গম্বর। সুতরাং তিনি সত্বর ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করেন কিন্তু তাতে তার উপর তা প্রজারা রেগে গেল। রাজা হিরাকল ভীষণ বিপদে পড়ে গেলেন যে, যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে এই সব লোকেরা আমাকে পদচ্যুত করবে। তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফাকে পারস্য সম্রাট কিসরা খসরু পারভেজের নিকট প্রেরণ করলেন। এই হতভাগা মুবারক পত্রটির সাথে বেয়াদবী করল এবং পত্রটিকে টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলল। মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) এর কানে যখন এই সংবাদটি পৌছল তখন তিনি বললেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা তার রাজত্ব কে তেমনি ভাবে টুকরা টুকরা করে দিবেন। যেমন ভাবে আমার পত্রটিকে টুকরা টুকরা করে দিয়েছে। সাইয়্যেদুল মুরসালীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দোআ কি করে বিফলে যায়। কিছু দিন পরেই খসরু পারভেজ তার পুত্র সেরুভিয়ার হাতে নির্মম ভাবে নিহত হয়।

হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআ (রাঃ) কে মিশর ও আকেজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট পাঠালেন। তার হৃদয়েও আল্লাহ তায়ালা ইসলামের সত্যতা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিলেন। সুতরাং বাদশাহ মুকাওকিস হযরত হাতেব (রাঃ) এর সাথে সৎ ব্যবহার করলেন। এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্যে কিছু হাদিয়া প্রেরণ করলেন। এর মধ্যে একজন বাদী মারিয়া কিবতিয়াও ছিলেন ও একটি সাদা বর্ণের খচ্চর ও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ও বিশজোড়া কাপড় ও ছিল।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) কে আম্মানের বাদশাহ জাফর ও আব্দুল্লাহ্ নিকট প্রেরণ করে ছিলেন। তারা ব্যক্তিগত তদন্ত ও অতীতের কিতাবাদীর দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি হল এবং তারা প্রজাদের নিকট হতে যাকাত আদায় করতে শুরু করলেন। এবং হযরত আমর ইবনে আসের নিকট আদায়কৃত যাকাত অপর্ণ করলেন।

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ও আমর ইবনে আসের ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ তখন পর্যন্ত প্রতিটি রণক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে আসছিলেন। অধিকাংশ জেহাদে বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধ শুধু তার কারণেই কাফেরদের পিচ্ছিল পা দৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নিজে নিজেই মুসলমান হবার জন্য মক্কা থেকে ভ্রমণ করে মদীনার পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আমর ইবনে আসের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সম্ভবত আমর ইবনে আসও এই উদ্দেশ্যেই রওয়ানা করেছেন। উভয়ে একসাথে মদীনায় পৌছে মুসলমান হয়ে গেলেন।

(এসাবা দ্রঃ)

হিজরী সন সপ্তম

(খাইবরের যুদ্ধ, ফাদাক বিজয় এবং উমরায়ে কাযা)

খাইবরের যুদ্ধ

মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনী নযীর যখন খাইবরে(১) যেয়ে বসতি স্থাপন করল, তখন খাইবরে ইহুদীদের কেন্দ্রে পরিণত হল। তারা আরবের নানা লোককে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। সপ্তম হিজরীর মহররম বা জুমাদাল উলা মাসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চারিশত পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তাদের সাথে জেহাদ করার লক্ষ্যে খাইবারের দিকে যাত্রা করেন। বিপুল হতাহতের পর আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। ইহুদীদের সকল দুর্গ মুসলমানদের হাতে চলে আসে। এই জেহাদে হযরত আলী (রাঃ) এর ভূমিকা ছিল অন্যতম। খাইবরের গেইট তিনি একাই উপড়ে ফেলেন। অথচ সত্তরজন লোকও তা উঠাইতে অপারগ ছিল। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি এই দরজাটি হাতের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছন। (যুরকানী)

ফাদাক বিজয়

খাইবরের বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) ফাদাকের ইহুদীদের প্রতি একটি পত্র প্রেরণ করার পর তারা সন্ধি স্থাপন করল।

উমরা কাযা

হুদাইবিয়ার সন্ধির বৎসর যে উমরা পরিত্যাগ করা হয়েছিল এবং কুরাইশী দের সাথে এই চুক্তি পত্র হয়েছিল যে আগামী বৎসর উমরা পালন করবেন এবং তিন দিনের বেশী মক্কায় অবস্থান করবেন না।

এ বৎসর তিনি ওয়াদা মোতাবেক সকল সাহাবীগণকে নিয়ে মক্কায় তাশরীফ নিয়ে যান এবং চুক্তির শর্তাদির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে উমরা সমাপনান্তে মদীনায় ফিরে এলেন।

হিজরী সন অষ্টম

(সারিয়া মুতা এবং মক্কা বিজয়)

(২)মুতা শামের (সিরিয়ার) বাল্‌কা শহরের অদুরবর্তী বায়তুল মুকাদ্দাস হতে দুই মন্‌যিল দুরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এই খানে মুসলমান ও

পার্শ্বটিকা ঃ (১) মদীনা শরীফ হতে সিরয়ার দিকে ৩/৪ মঞ্জিল দুরে অবস্থিত একটি বড় শহর। (মুরকানী ২/২১৭)

(২) মুতা শব্দের মীমের উপর পেশ, ওয়াও সাকিন (ওয়াও এর উপর হামযা ব্যতিত) এবং কাহারো ২ নিকট ওয়াও এর উপর হামযা হবে। (যরকানী ২/২৬৭পৃঃ)

রোমাদের মধ্যে সর্ব বৃহৎ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধের কারণ এই ছিল যে, রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বসরার গর্ভণর আমর ইবনে উমায়ের (রাঃ) কে হত্যা করেছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্য অষ্টম হিজরী সনের মাঝামাঝি তিন সাহাবার একটি দল প্রেরণ করলেন। মুসলমান সৈনিকেরা যখন মুতায় উপনীত হল তখন রোমানরা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের মুকাবেলার জন্য অগ্রসর হল। দীর্ঘ কয়েক দিন যুদ্ধ হবার পর আল্লাহ তায়ালা দেড়লক্ষ কাফের বাহিনীর উপর তিন হাজার মুসলমানের ভয় এমন ভাবে ঢেলে দিলেন যে, পিছু হঠে যাওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোন উপায় ছিলনা। (তাল্খীসুস্ সীরাত দ্রঃ)

অবশ্য মাত্র ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা কে ক্ষমা করা হয় নাই। যাদের অস্তিত্বই ছিল যাবতীয় দুর্নীতির উৎস। কিন্তু তারা সকলেই বিভিন্ন দিকে ছড়ে পড়ল এবং পরে তাদের অধিকাংশ লোক মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় তাইয়্যেবায় পৌঁছে মুসলমান হয়ে যায়।

২০শে রমযান রোজ শুক্রবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কা'বা শরীফ তাওয়াফ সমাপ্ত করলেন। তখন পর্যন্ত কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র হাতে একটি লাকড়ী ছিল। তিনি যখন কোন মূর্তির পার্শ্বদিয়ে যেতেন তখন তা দ্বারা ইশারা করতেন আর মূর্তিটি মুখ নিচু হয়ে উপর হয়ে পড়ে যেত। তিনি তখন নিম্ন লিখিত আয়াতটি পাঠ করলেন–

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا–

অর্থাৎ সত্যের সমাগম হয়েছে, বাতিল পারাভূত হয়েছে। বাতিল তো নিশ্চয়ই পরাভূত হওয়ার যোগ্য।

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের আচার ব্যবহার

তাওয়াফ শেষ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহা শাইবীর নিকট হতে চাবি নিয়ে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এর ভিতর হতে বাহির হয়ে মাকামে ইব্রাহীমের উপর নামায পড়লেন। নামায হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কুরাইশদের ব্যাপারে কি হুকুম তিনি জারি করবেন লোকজন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সব কিছুর অবসান করে কুরইশদের কে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা সকল দিক থেকেই স্বাধীন ও নিরাপদ। অতঃপর তিনি কা'বা শরীফের চাবিও তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিলেন। (তালখীসুস-সীরাত)

মহানবী (সাঃ) এর চরিত্র

আবু সুফিয়ানের উসলাম গ্রহণ

তখন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের পাতাকাধারী বড়নেতা ছিলেন। আনুমানিক কুরাইশদের ইসলাম বিরোধী সকল যুদ্ধের সেনপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বক্ষনে মুসলমান বাহিনীর খবরা খবর নেওয়ার জন্য তিনি মক্কার বাহিরে আসলে সাহাবীগণ তাকে গ্রেফতার করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট হাযির করলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তাতে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে আবু সুফিয়ান সত্বর মুসলমান হয়ে গেলেন। বর্তমানে আমরা তাকে হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলে থাকি।

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি কাপতে কাপতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দরবারে হাযির হলেন। আপাদ মস্তক রহমতের ছবি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, "স্থির হও শান্ত ও নিশ্চিত থাক। আমি কোন রাজ রাজা নহি বরং একজন সাধারন মহিলার সন্তান।"

মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কা শরীফ পনর দিন ছিলেন। এই সময় আনসারগণ এই কথা ভেবে কষ্ট পেতে ছিলেন যে, এখন তো মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতেই অবস্থান করবেন আর আমরা তার নিকট হতে দূরে সরে পড়ব। কিন্তু যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই বিষয়ে খবর হল তখন তিনি বললেন, না বরং এখানে আমাদের মৃত্যুও জীবন তোমাদের সাথেই জড়িত। অতঃপর হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রাঃ) কে মক্কার শাসন কর্তা নিযুক্ত করে তিনি স্বয়ং মদীনা তাইয়্যেবার দিকে রওয়ানা করলেন।

হুনায়নের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর ব্যাপক ভাবে আরবগণ ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলেন। কেননা তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন ছিল যারা ইসলামের বাস্তবতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিবার পরও কুরাইশদের ভয়ে মুসলমান হওয়া থেকে বিরত থেকে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করতেছিলেন। এখন তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করাতে লাগলেন। অবশিষ্ট আরবদের এমন শক্তি ও ছিলনা, যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে পারে।

অবশ্য বনি হাওয়াযিন ও বনি সকীফ গোত্র দ্বয় আত্মসম্মানের খাতিরে যুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে মক্কা শরীফের দিকে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে অগ্রসর হল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ১২ হাযার সৈন্য তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করলেন। যাদের মধ্যে ১০ হাযার তো মুহাজের ও আনসার ছিলেন যারা মদীনা থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন এবং ২ হাযার নওমুসলিম ছিলেন যারা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন। (এই সংখ্যাটি এখন পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীর সবচেয়ে বড় সংখ্যাছিল)। হিজরী অষ্টম সনে ৬ই শাওয়াল আল্লাহর এই বাহিনী রওয়ানা হলেন। যখন তারা হুনায়েন(১) প্রান্তরে পৌঁছলেন, তখন শত্রু বাহিনী পাহাড়ের ঘাঁটিতে লুকানো অবস্থা থেকে হঠাৎ মুসলমানদের উপর আক্রমন করল। যেহেতু সৈন্যদের তখন পর্যন্ত ও কাতারবন্দী করা হয়নাই এজন্য মুসলমান সৈন্যের সম্মুখভাগ পশ্চাদগামী হতে লাগল। এ পিছপা হবার বাহ্যিক কারণ সৈন্যদের কাতারবন্দী না হওয়াকে যদিও দায়ী করা হয় আসল কারণ কিন্তু তা নয়। কুরআনে কারীম এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছে।

অর্থাৎ মুসলমানগণ সেই সময় তাদের চিরাচরিত্র অভ্যাস বাদ দিয়ে নিজেদের সংখ্যা গরিষ্টতা ও সাজ সরঞ্জাম দেখে গর্ববোধ করেছিল। কোন কোন সাহাবী এমন কি হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর যবানেও এ কথা উচ্চারিত হয়েছিল যে, আজ আমরা পরাজয় বরণ করতে পারিনা।

এজন্য এই ব্যবস্থা প্রকাশ করলেন, যেন তারা বুঝে নিতে পারে যে আমাদের বিজয় পরাজয় আল্লাহর হাতে, আমাদের শক্তি ও তীর তরবারীর উপর নয়।

این همه مستی وبی هوشی نه حدباده بود

باحریفان انچه کردآن نرکس مستانه کرد–

শক্তি কোথা সেই নারগিসের
ছড়াবে রং মোর পরানে?
যেজন আছে তার অগোচরে
সেইতো আমায় কাছে টানে।

পার্শ্ব টিকাঃ (১) হুনায়েন মক্কা হতে তিন মানযিল দুরে তায়েফের নিকট একটি স্থানে। (মোগলতাঈ ৭২ পৃঃ)

বদরের যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকা অবস্থায়ও মুসলমানদের বিজয় আর হুনায়নের যুদ্ধে প্রচুর সাজ সরঞ্জাম থাকা সত্বেও পরাজয়ের এটাই রহস্য ছিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই সময় দুটি বর্ম পরিধান করে একটি দুলদুলনামক সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন।

নিজেদের কাফেলাকে পিছপা হতে দেখে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হুকুমে হযরত আব্বাস (রাঃ) মুসলমানদেরকে এক সাহসিকতারপূর্ণ আওয়ায দিলেন যদ্বারা তাদের নড়বড়ে পা সুদৃঢ় হয়ে গেল এবং উভয় দলেন মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

একটি সুমহান মোজযা
(এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সকল শত্রু বাহিনী পরাজয়)

এই দিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যমীন থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়ে দুশমন বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর কুদরতে দুশমন বাহিনীর সকলের চোখেই গিয়ে পতিত হল এমনভাবে যে, একটি চোখও বাকী ছিল না যাদের চোখে মাটি পতিত হয় নাই। (মাগলতাঈ)

পরিশেষে দুশমন বাহিনী ভয়ে ও পরাজয়ের গ্লানি মেখে পলায়ণ করল। চারজন মুসলমান এবং কাফেরদের সত্তরজন থেকে বেশী লোক নিহিত হয়। মুসলমানগণ প্রতিশোধের জোশে বাচ্চা ও মহিলাদের প্রতিও আক্রমণ করতে উদ্যত হলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের নিষেধ করলেন। (মাগল তাই ৭২পৃঃ)

তায়েফের যুদ্ধ

এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তায়েফের দিকে দৃষ্টি দেন। তায়েফ বনি সাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের কেন্দ্র ছিল। আনুমানিক ১৮ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রাখা হল কিন্তু বিজয় লাভ হয়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন রাস্তায় জিরানা নামক স্থানে তায়েফ হতে হওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তার খেদমতে হাযির হল এবং আবেদন করল যে, হুনায়েনের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের হাতে যে সকল লোক বন্দী হয়েছে তাদিগকে মুক্তি দেয়া হোক। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আবেদন গ্রহণ করলেন। এবং বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তায়েফ হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তায়েফের একটি প্রতিনিধি দল তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ)

ওমরা জি'রানা

হুনায়েন যুদ্ধের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জি'রানা নামক স্থান থেকে ওমরা পালন করার ইচ্ছা করলেন এবং ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ তাশরীফ আনলেন। ওমরা আদায় করার পর আবার মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। হিজরী অষ্টম সনের যিল্‌কাদা মাসের ৬ তারিখে তিনি মদীনা অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

হিজরি সন নবম

(তাবকের যুদ্ধ, হাজ্জুল ইসলাম, প্রতিনিধিদের আগমন, দলে দলে ইসলাম গ্রহণ)

তবুক যুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন

তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর হিজরী নবম সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনাতেই অবস্থান করেন। অতঃপর তার নিকট সংবাদ এল যে, মুতার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবার জন্যে তবুক নামক স্থানে (মদীনা থেকে ১৪ মানযিল দূরে) বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে। মহানবী (সাঃ) ও জেহাদের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সে সময় মুসলমানরা দূর্ভিক্ষের দরুণ অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্যে দিনগুলো কাটাতে ছিলেন। এছাড়া প্রচণ্ড গরমও ছিল। কিন্তু প্রাণ বিসর্জনকারী সাহাবীদের জামাত এরপরও জেহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়লেন। জেহাদ ফান্ডে চাঁদা দানের আবেদন করা হলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ঘরের সকল আসবাবপত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে এনে হাযির করলেন। হযরত উসমান (রাঃ) যুদ্ধে চাঁদা বাবৎ একবিরাট সাহায্য প্রদান করলেন যার মধ্যে ৯০০ উট এবং ১০০ ঘোড়া ছিল।

(মোগলতাঈ ৭৬ পৃঃ)

রজব মাসের বৃহস্পতিবার ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী তবুকের দিকে যাত্রা করেন।

কতিপয় মো'জেযা

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পথিমধ্যে আবু যর গিফারী (রাঃ) কে দেখতে পেলেন যে, তিনি দল হতে আলাদা হয়ে চলেছেন। তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি দুনিয়ার সংশ্রব হতে আলাদা হয়ে চলবে, আলাদাই জিন্দিগী কাটাবে। এবং আলাদাই মৃত্যু বরণ করবে। সুতরাং ঘটনা তাই হয়েছিল।

এ যুদ্ধেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ওহী দ্বারা জানিয়ে দেয়া হলো যে, উটনীর লাগাম একটি বৃক্ষের সাথে অমুক স্থানে আটকে গেছে সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে. অবস্থা তদ্রুপই। (সীরাতে মোগলতাঈ ৭৭ পৃঃ)

মুসলমানগণ যখন তবুক পৌঁছলেন, তখন এই জায়গায় কেউ ছিলনা। বাদশাহ্ হেরাক্লা (হিরাক্লিয়াস) হিমাস চলে গিয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) কে উকাইদির নামক খ্রীষ্টানের নিকট প্রেরণ করলেন এবং ভবিষ্যদ্বানী করলেন যে, তোমরা রাত্রিবেলা এই অবস্থায় তার সাথে মিলিত হবে যে, সে তখন শিকারে থাকবে। হযরত খালেদ (রাঃ) সেখানে পৌঁছে তাই দেখলেন এবং তাকে বন্দী করে নিয়ে এলন। মোটকথা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেখানে প্রায় ১৫/২০ দিন অবস্থান করেছেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ হয় নাই। বাধ্য হয়ে তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন। ইহাই ছিল তার সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান। নবম হিযরী রমযান মাসে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মসজিদে যেরারকে অগ্নিদাহ করা

তবুক যুদ্ধ হতে ফেরার পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ জায়গাটিকে অগ্নিদাহ করার জন্য হুকুম করলেন যা মুনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রনা করার জন্য মসজিদের নামে তৈরী করেছিল এবং মুসলমানদেরকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এর নাম মসজিদ রেখেছিল। (মোগলতাঈ)

এদ্বারা বুঝাগেল যে, মসজিদে যেরার আসলে মসজিদই নয়।

প্রতিনিধিগণের আগমনও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সার্বিক অবস্থা যখন অনুকুলে চলে এল প্রচার প্রসার (যার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল বেশী) ব্যাপক আকারে শুরু হল। এজন্যই এ সন্ধির নাম আসমানী দফতরে বিজয় রাখা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও কিছু লোক কুরাইশদের অত্যাচারের ভয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে পারছিলনা। মক্কা বিজয় এ অসুবিধা দূর করে দিল। এখন পবিত্র কুরআন সারা আরবের

ঘরে ঘরে পৌঁছে নিজের অসাধারণ ক্ষমতার দ্বারা সকলের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। যার ফলাফল এ দাঁড়াল যে, সকল লোকেরা কোন মতেই ইসলাম ও মুসলমানের চেহারা দেখা পছন্দ করতনা, সে সকল লোকেরাই দলে দলে দুর-দূরান্ত হতে এসে প্রতিনিধির আকারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে হাযির হতে লাগল এবং স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করে নিজেদের জান মাল উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এই প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ হিযরী নবম সনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়।

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিগণ

তবুক যুদ্ধের পরেই সাকীক গোত্রের প্রতিনিধিগণ মদীনায়ে তাইয়্যেবায় হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর একে একে প্রতিনিধি আসতে শুরু হয়। যাদের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়।(১) এর মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

বনী ফাযারার প্রতিনিধিগণ

এ গোত্রের লোকেরা পূর্বেই মুসলমান হয়েছিল। পরে প্রতিনিধি আকারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে হাযির হয়।

বনী তামীমের প্রতিনিধিগণ

তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হন এবং কিছু কথাবার্তার পর সকলেই মুসলমান হয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যান।

বনী সা'দ ইবনে বকরের প্রতিনিধিগণ

এই গোত্রের প্রতিনিধিগণের দলপতি ছিলেন যেমাম ইবনে সালাবা। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনেক প্রশ্ন করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের যথা জবাব প্রদান করলেন। ধর্মের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তাহ্‌কীক এবং অন্তর উপযুক্ত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে আপন গোত্রে প্রত্যাবর্তন করে দ্বীন প্রচারের ফলে তাদের গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যান।

পার্শ্বটিকা ঃ ১। হাফেজ মোগতাঈ তাদের নাম বিস্তারিত বর্ণনা করছেন। (সীরাতে মোগলতাঈ ৭৭ পৃঃ দ্রঃ)

কিন্দার প্রতিনিধিগণ

সূরায়ে সাফফাতের প্রথমাংশের আয়াতগুলি শুনা মাত্রই তাদের অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এরপর তারা সকলেই মুসলমান হয়ে যান।

বনী আঃ কায়েসের প্রতিনিধিগণ

তারা পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন। পরে সকলেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিক্ষা প্রদান করেন।

বনী হানীফের প্রতিনিধিগণ

তারাও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হয়ে যান। মুসায়লামাও তাদের মধ্যে শামিল ছিল। যে পরবর্তী সময়ে নবুওয়াতের দাবীর কারণে হযরত সিদ্দিক আকবর (রাঃ) এর যমানায় সাহাবাগণের হাতে দলবলে নিহত হয়।

ফায়দাহ

মুসাইলামা কায্যাব নবুওয়াতের দাবীর সময়েও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআন এবং ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল।

(১)সুতরাং হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের অভিজ্ঞ শায়খ আবু জাফর তাবারী (রাহঃ) তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুসায়লামা তার মুয়ায্যিন কে আযানের মধ্যে সবসময় اشهد ان محمدارسول الله বলার হুকুম প্রদান করে রেখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর যেকোন ধরনের নবুয়তের দাবী করা সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল; বরং সাধারণভাবে নবুয়তের দাবী করা অসংখ্য কুরআনের আয়াত, মুতাওয়াতের হাদীস সমূহ এবং উম্মাতে ঐক্যমতের আকীদা মোতাবেক খতমে নবুয়তকে অবিশ্বাস করারই নামান্তর। তাই সাহাবীগণের ঐক্যমতে মুসায়লামার পৃথক শরীয়ত বিহীন নবুয়তের দাবীও সাহাবীগণ কুফর মুরতাদ হওয়ার অন্তর্ভূক্ত বলে সাব্যস্ত করেন। সাহাবীগণের ইজমা বা ঐক্যমতে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা

পার্শটিকা ঃ ১। হাফেজ মোগতাঈ তাদের নাম বিস্তারিত বর্ণনা করছেন। (সীরাতে মোগলতাঈ ৭৭ পৃঃ দ্রঃ)

হয়েছিল। তার আযান, নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি তাকে কাফের বলা হতে সাহাবীগণকে বিরত রাখতে পারেনি।

মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী মুসয়লামা কাযযাব থেকেও অনেক বেশি বড়।

শুধু তাই নয় যে, সে নিজেকে সকল নবীগণ থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে করে বরং অনেক নবীকে এমন মর্মান্তিক ও অপমানজনক মন্তব্য করে থাকে যে, কোন সভ্য লোকের দ্বারা তা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর সে তার অপবাদের ঝুলি খালি করে ঢেলেছে। যে তাকে এমন নিলজ্জ গালিগালাজ করেছে যে, কোন মুসলমান তা শুনে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে না। যার প্রমাণ তার স্বরচিত বই।

"আনজামে আথস" "দাফেউল বালা" "নুযুলুল মসীহ্" পুস্তক পাঠ করে প্রত্যেক যাচাই করতে পারেন। এ ধরনের আরও বহু শিরকী দাবী দেখে সকল ইসলামী ফের্কার ওলামাগণ সম্মিলিতভাবে যদি তাকে কাফের ফতোয়া প্রদান করেন এবং তার নামায রোযা ও স্ব-কল্পিত ইসলামী প্রচারের প্রতি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তা হবে সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাতেরই অধিক অনুসরণ। এতে তাদের উপর কোন রকম দোষারোপ করা যাবে না।

বনী কাহ্ তানের প্রতিনিধিগণ

এদের গোত্রপতি ছিলেন যায়েদ আল খাইল তারা সকলেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে যান।

বনী হারেসের প্রতিনিধিগণ

এদের মধ্যে হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) ছিলেন। তিনি তার সঙ্গী সাথীগণসহ মুসলমান হয়ে যান। এভাবেই বনী মুহারিব হামদান গাচ্ছান ইত্যাদি গোত্রের প্রতিনিধিগণের হাজির হবার পূর্বে আবার কেউ কেউ হাজির হবার পরে মুসলমান হন। হিম্য়ারের বিভিন্ন সরদার যাদের কে নিজ নিজ গোত্রের লোকেরা বাদশাহ্ মনে করত। তোদের পক্ষ হতে দুত সংবাদ নিয়ে এলে তারা সকলেই মুসলমান হয়েগেছে। এবং এই ভাবে পদব্রজে ও অশ্বরোহী প্রতিনিধিগণ হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। এমন কি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দশম হিজরীতে হজ্জ অনুষ্ঠানে একলক্ষের অধিক মুসলমান শরীক হন। এবং যারা এই হজ্জে হাজির হতে পারেননি তাদের সংখ্যা এদের চেয়ে কিছু বেশী ছিল।

সিদ্দিকে আকবরকে হজ্জের আমীর বানানো

তবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীসনের যিলকাদা মাসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করেন।

হিজরী সন দশম

হাজ্জুল ইসলাম বা বিদায় হজ্জ

১০ম হিজরী সনের ২৫ শে যিলকাদা রোজা সোমবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। সাহাবীগণের এক বিশাল দল তার সাথী হলেন, যাদের সংখ্যা একলক্ষের চেয়েও বেশী ছিল। মদীনা শরীফ থেকে ছয়মাইল দুরে যুলহুলাইফা নামক স্থানে তিনি ইহরাম বাঁধেন। ৪ঠা যিলহজ্জ শনিবার মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন এবং শরীয়তের নীতি নিয়মানুযায়ী হজ্জব্রত পালন করেন।

আরাফাতের ময়দানে বিদায়ী ভাষণ

যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে তাশরীফ এনে এক বিস্তারিত ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি ছিল অত্যন্ত নসীহতপূর্ণ ও বিধিবিধান বিষয়ক আল্লাহ তাআলার আখেরী রাসূল (সাঃ) এর আখেরী পয়গাম বিশেষতঃ নিম্ন বর্ণিত বানী সমূহ প্রত্যেক মুসলমানকে তার হৃদয় পটে ক্ষুধিত করে নেয়া দরকার–

“হে মানব মন্ডলী! আমার কথা শুন যাতে আমি তোমার জন্য দ্বীনের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বর্ণনা করতে পারি। আগামী বৎসর আমি তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি কিনা তা আমার জানা নেই”। এরপর বললেন, মুসলমানদের জানমাল ইজ্জত আব্রু কেয়ামত পর্যন্ত এমনই সম্মানিত যেমনভাবে আজিকার দিবস (আরাফাহ) এই (যিলহজ্জ) মাস এবং এই (মক্কা) শহর তোমাদের কাছে সম্মনিত। এ জন্যই কাহারও নিকট কাহারো আমানত গচ্ছিত থাকলে তা অবশ্যই আদায় করে দিবে। অতঃপর বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীগণের তোমাদের উপর কিছু অধিকার রয়েছে। মুসলমান একে অপরের ভাই। কারো জন্য তারা ভাইয়ের মাল তার এজাযত ব্যতিত বৈধ হবে না। আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে যেওনা। এবং একে অপরকে

হত্যা করোনা। এ জন্যই আমি আল্লাহ্‌র কিতাব আমার পরে রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা শক্তভাবে ধারণ করে রাখ তাহলে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবেনা। অতঃপর বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের পরওয়ারদিগার এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলেই আদম (আঃ) এর সন্তান এবং আদম (আঃ) মাটি হতে সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে সেই বেশী সম্মানী যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু। কোন আরবী কোন অনারবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেনা একমাত্র পরহেযগারী ছাড়া। স্মরণ রেখ, আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো যে, আমি তাদের নিকট তোমার বাণী পৌঁছিয়েছি। উপস্থিত লোকদের উচিত তারা অনুপস্থিত লোকদের নিকট এ সব বাণী পৌঁছে দেয়া। হজ্জ পর্ব শেষ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দশ দিন মক্কায় অবস্থান করার পর মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

হিজরী সন একাদশ

(সারিয়া উসামা, অন্তিম অসুখ, ওফাৎ)

সারিয়া উসামা

মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনের পর একাদশ হিজরীর ২৬শে সফর রোজ সোমবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি সারিয়া রোমানদের বিরুদ্ধে তৈরী করেন। এই সারিয়াতে হযরত সিদ্দিক আকবর (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) এর মত প্রমুখ সাহাবীগণ শামিল ছিলেন। এই যুদ্ধাভিযানের নেতৃত্ব হযরত উসামা (রাঃ) এর উপর অর্পিত হয়। ইহা ছিল সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান যা পাঠানোর সকল ব্যবস্থাপনা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং নিজে সম্পন্ন করেন। তা রওয়ানা হবার পূর্বেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন।

মহানবী হযরত (সাঃ) এর অন্তিম অসুখ ও ওফাৎ

একাদশ হিজরী সনের ২৮শে সফর রোজ বুধবার দিবাগত রাত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) "বাকী গারকাদ" নামক কবরস্থানে গমন পূর্বক কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে দোয়ায়ে মাগফেরাত কামনা করে বললেন যে, হে কবরবাসীগণ! তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কবরের অবস্থান শুভ হউক।

কেননা এখন পৃথিবীতে ফেতনার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েবে। সেখান থেকে তিনি প্রত্যাবর্তনের পর মাথা মোবারকে ব্যথা অনুভব করলেন। এবং সাথে সাথে জ্বরও এসে পড়ল(১)। সহীহ্ বর্ণনা মতে এ জ্বর ১৩ দিন ধারাবাহিক ছিল।। এ রোগেরই তাঁর ওফাৎ(২) হয়। এ সময় তিনি তাঁর নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক দিবসে পবিত্রা রমনীগণের হুজরায় স্থানান্তর হতে থাকেন। যখন তার অসুখ দীর্ঘ ও কঠিন আকার ধারণ করল, তখন পবিত্রা রমণীগণের নিকট হতে এ অনুমতি নিলেন যে, অসুখের দিন গুলিকে আমি আয়েশা (রাঃ-আনহা) এর গৃহে অবস্থান করব। তাতে সকলেই অনুমতি দিয়ে দেন।

সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর ইমামতি

আস্তে আস্তে অসুখ এত বাড়ল যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মসজিদেও তাশরীফ নিতে পারেন না। তখন বললেন, "আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে যেন বল ইমামতি করতে"। ঘটনাক্রমে একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) আনসারদের এক মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তারা দেখতে পেলেন লোকেরা কাঁদছে। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মজলিসের কথা মনে করে কাঁদছে। হযরত আব্বসা (রাঃ) এই খবরটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট জানালেন। তিনি এ সংবাদ শুনতে পেয়ে হযরত আলী এবং হযরত ফযল (রাঃ) এর কাঁধে ভর করে বাইরে গমন করলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁর আগে আগে ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মিম্বরে আরোহন করলেন কিন্তু শরীর দুর্বলতার কারণে নীচের সিঁড়িতেই বসে পড়লেন; উপরে উঠতে পারলেন না। তারপরে তিনি এক অলংকার পূর্ণ ভাষণ দান করলেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

শেষ নবীর শেষ ভাষণ

হে মানব মণ্ডলী! আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় করছ। আমার পূর্বে কি কোন নবী চিরদিন পৃথীবিতে ছিল যে, আমি চিরদিন পৃথিবীতে থাকব? হ্যাঁ, আমি আমার পরওয়ারদিগারের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। এবং তোমারও আমার সাথে মিলিত হবে। তবে তোমাদের মিলিত হবার স্থান "হাউজে কাউসার"। অতঃপর যে ব্যক্তি ইহা

পার্শ্বটিকা ঃ (১) সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৪।

২। ফতহুল বারী হিন্দী, ১৮ পারা, পৃষ্ঠা ৯৮।

পছন্দ করে সে কিয়ামতের দিন এই হাউজে কাউসার হতে পরিতৃপ্তির সাথে পানি পান করবে। তার উচিত আপন হাত এবং মুখকে অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথাবার্তা হতে বিরত রাখা। তোমাদের মুহাজেরীনদের সাতে সদ্ব্যবহার করতে অসিয়ত করছি।

তিনি আরও বলেন, "যখন লোকেরা আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন তাদের শাসক ও বাদশাহ্গণ তাদের সাথে ইনসাফের ব্যবহার করবেন। আর যখন তারা তাদের পররওয়ারদিগারের সাতে নাফরমানী করে, তখন তাদের শাসকগণও তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে থাকে।" (দুরুসুস সিরাতিল হামিদীয়া)

অতঃপর তিনি গৃহে ফিরে এলেন। এবং ওফাতের পাঁচ অথবা তিন দিন পূর্বে আবার একবার বাইরে আগমন করেন। তখন তার মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নামায পড়াতে ছিলেন।(১) (মহানবী (সাঃ) এর আগমন টের পেয়ে তিনি পিছনে আসতে লাগলেন। মহানবী (সাঃ) নিজের হস্ত মোবারকের ইশরায় নিষেধ করলেন, এবং নিজে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বাম পার্শ্বে বসে গেলেন।(২) নামাযর পর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, "আবু বকরের দান আমার প্রতি সব চেয়ে বেশী। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া আর কেহ খলিল নয়। সেহেতু আবু বকর সিদ্দিক এবং দোস্ত। তিনি আরও বললেন, "মসজিদে নববীতে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর দওরযায় ছাড়া বাকী সকল লোকদের যত দরওয়াযা আছে সবগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক। (বোখারী)

এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর মোহাদ্দেস ইবনে হাব্বান (রাহঃ) বলেন, এই হাদীস পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) এর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইসলামী দুনিয়ার খলীফা হবেন। (ফতহুল বারী ১৪ পারা, ৩৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ)

এর পর ২রা(৩) রবিউল আউয়াল মাসে রোজ সোমবার লোকেরা ফজরের নামায হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর পিছনে পড়ছিলেন। তখন

পার্শ্বটিকা ঃ ১। সহীহ বর্ণনামতে ইহা যোহরের নামায ছিল। (ফতহুল বারী)

২। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এই সময় মহানবী (সাঃ) ইমাম ছিলেন। সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এবং সকল মুক্তাদীগণ তার ইকতেদা করছিলেন। অবশ্য সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উচ্চস্বরে তাকবীর বলছিলেন। (মিশকাত বাবে মুতাবাআতুল ইমাম দ্রঃ)

৩। মশহুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) ১২ই রবিউল আওয়াল ওফাত লাভ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ সেটাই লিখে আসছেন। কিন্তু হিসাব অনুযায়ী এই তারিখ কিছুতেই সঠিক নহে। কেননা, এই কথা সর্বজন স্বীকৃত ও নিশ্চত যে, সোমবার দিনটি ছিল ওফাতের দিন। এবং তাও নিশ্চিত যে, মহানবী (সাঃ) ৯ই যিলহজ্জ রোজ শুক্রবার শেষ হজ্জটি আদায় করেন। এই দুইটি বিষয় পর্যালোচনা কলে দেখা যায় ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার দিন পড়ে না। এই জন্যই হাফেজ ইবনে হাজার আসাকালানী বোখারী শরীফের ব্যাখা গ্রন্থে দীর্ঘ বর্ণনার পর তাই সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ওফাতের সঠিক তারিখ হল ২রা রবিউল আওয়াল। লিখনীর ভুলে ২ এর পরিবর্তে ১২ এবং আরবি বাক্য ثانی شهر ربیع الاول এর পরিবর্তে ثانی عشرربیع الاول হয়ে গেছে। আল্লামা হাফেজে হাদীস আলাউদ্দিন মোগলতাঈ (রাহঃ) ও ২রা রবিউল আওয়াল কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

হঠাৎ মহনবী (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ-আনহা) এর হুজরার পর্দা উঠিয়ে লোকদিগকে নামায পড়তে দেখে মৃদু হাসলেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর তা টের পেয়ে পিছনে সরে আসতে লাগলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে সাহাবীগণের মনও নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক যেতে লাগল।

কোন এক কবি বলেন ঃ

درنمازم خم ابروی توجون یاد آمد

حالتی رفت کی محراب بفریادآمد-

অর্থাৎ "চেহারা তোমার নামাযেতে
আমার যখন হয় গো স্মরণ,
এগিয়ে আসে মেহ্‌রাব তখন
আমার সাথে করে কথোপকথন।"

মহানবী (সাঃ) তাদেরকে হাতের ইশারায় বললেন যে, তোমরা নামায পূর্ণ কর এবং তিনি ভিতরে চলে গেলেন ও গৃহের দরওয়াযার পর্দাটি নামিয়ে দিলেন। এর পর আর তিনি বাইরে আগমন করেননি। এই দিনই যোহর নামাযের পর মহানবী (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে রফিকে আলা (উর্ধ্ব জগতের বন্ধু) এর সাথে মিলিত হয়ে যান। اناالله وانا اليه راجعاون সহীহ্ বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র হায়াত ছিল ৬৩ বৎসর।

মহানবী (সাঃ) এর শেষ বাক্য সমুহ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ-আনহা) বলেন, এ অসুখের দিনগুলোতে কোন কোন সময় চেহারা হতে চাদর সরিয়ে মহানবী (সাঃ) বলতে, "ইহুদী ও আসারাদের উপর আল্লাহর লানত এ জন্যেই পড়ত যে, তারা তাদের নকীগণের কবর সমূহের উপর সেজদা করত।" উদ্দেশ্য ছিল যে, ইহা দ্বারা মুসলমানগণ পাপাচার হতে বেঁচে থাকে। (বোখারী ১০৫ পৃষ্ঠা)

আফসোস! মহানবী (সাঃ) জীবনের মুসলমানরা পরিত্যাগ করেনি। এবং ওলী নেককারগণের কবর সমূহকে সেজদার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে (নাউজুবিল্লা)।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) আরো বলেন, ওফাতের নিকটবর্তী সময়ে মহানবী (সাঃ) আকাশের দিকে তাকাতেন এবং বলিতেন–اللهم رفيق الاعلى অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি উর্ধ্বজগতের বন্ধুকে পছন্দ করি।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, জীবনের শেষ সময়ে মহানবী (সাঃ) এর জবান মোবারকে الصلوٰة الصلوٰة অর্থাৎ নামায বাক্যটি(১) জারী ছিল। এবং যতক্ষণ শব্দ শোনা যেত এই বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন।

−(খাসায়েসে কুবরা দ্রঃ)

ওফাতের খবর সাহাবীগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সকলেই বুদ্ধিশুর্ণ হয়ে পড়লেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর মত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণ শোকের আধিক্যে মহানবী (সাঃ) এর ওফাতকে অস্বীকার করতে লাগলেন। এ সময় সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) আগমণ করলেন এবং সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতায় তিনি লোকদের ধৈর্য্য ধারণ করবার উপদেশ প্রদান পূর্ব বললেন, "যে ব্যক্তি মহানবী (সাঃ) এর উপাসনা করত সে শুনে রাখুন যে, তাঁর ওফাত হয়ে গিয়েছে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত সে জেনে রাখুক যে, তিনি অমর ও চিরঞ্জীব।" তা শুনে সাহাবায়ে কেরামের হুশ ফিরে এল।

অতঃপর যেহেতু মহানবী (সাঃ) এর ওফাতের পর খলীফা নিযুক্ত করা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেহেতু সাহাবীগণ দাফন কাফনের পূর্বেই খলীফা নিযুক্ত করাকে অত্যন্ত জরুরী মনে করলেন। কেননা, ধর্মীয় ও পার্থিব কাজ কর্মের বিশৃংখলা এবং ভিতরগত বাহিরগত দুশমনদের আকমণাশংকা ছাড়াও মহানবী (সাঃ) এর দাফন কাফনের ব্যাপারে ও মতবিরোধ দেখা দেওয়ার শক্ত আশংকা ছিল। এ জন্যেই বিষয়টি ফয়সালা করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। এবং এ কারণেই সোমবার বিকাল হতে বুধবার রাত্র পর্যন্ত দাফন কাফন স্থগিত রাখতে হয়েছিল। বুধবার রাত্রে হযরত আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ তাকে গোসলও কাফন পরালেন, এবং নামাযে জানাযা পড়া হল। নির্ভর যোগ্য হাদীস অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) এর কবর শরীফ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হুজরা শরীফের সে স্থানটিতে খনন করা হয়েছিল। যে স্থানে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) কবরে নেমেছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর কবর শরীফ অর্ধ হাত উঁচু রাখা হয়।

সীরাতুন নবী বা নবীর জীবন চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করার পর তার উত্তম চরিত্রের অংশবিশেষ সংক্ষিপ্তাকারে পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করা সমীচিন মনে করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তা আমল করার তওফীক দান করবেন। আর ইহা তার ক্ষমতার বাইরে নয়।

পার্শ্বটিকা ঃ বায়হাকী শরীফে হযরত আয়েশার বর্ণনায় আছে যে, জীবনের শেষ সময়ে যবান মোবারকে এই বাক্যটি ছিল যে, الصلوٰة الصلوٰة وماليمانكم অর্থাৎ নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ লোকদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে।

মহানবী (সাঃ) এর মহান চরিত্র ও মো'জেযা সমূহ

মহান চরিত্র

(১)মহানবী (সাঃ) সবচেয়ে বেশী সাহসী বাহাদুর এবং অধিক দানশীল ছিলেন। যখনই কেউ কোন জিনিষ চাইত সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা দিয়ে দিতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। এমনকি সাহাবাগণ একবার কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদুআ করার জন্য মহানবী (সাঃ) এর নিকট আরয পেশ করলে তিনি বললেন, "আমি রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। অভিসম্পাত করার জন্য আসিনি।" তার দন্তমোবারক শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখনও তাদের জন্যমাগফিরাতের দু'আই করেছিলেন। তিনি সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তার দৃষ্টি কারো উপর স্থিরকৃত হত না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি প্রতিশোধ নিতেন না। এবং গোস্বাও হতেন না। তবে আল্লাহর বিধি-বিধানের উপর কেউ হাত উঠালে গোস্বা হতেন। যখন তিনি গোস্বা হতেন তখন কেউই তার সামনে দাঁড়াতে সাহস করত না। যখন তাকে যে কোন দুইটি কাজের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হত, তখন তিনি সব সময় তন্মধ্যে সহজ যে কাজটি সেটিই গ্রহণ করতেন। (যাতে উম্মতের জন্য আসান হয়ে যায়)। মহানবী (সাঃ) কখনও কোন খাবারের মধ্যে আয়েব লাগান নাই। অবশ্য যদি কোন খাবার পছন্দ হত খেয়ে নিতেন। নতুবা পরিত্যাগ করতেন। তিনি কোন কিচুতে হেলান দিয়ে খাননি। এবং টেবিলে বসে ও বক্ষ বরাবর রেখে খানা খাননি।

তার জন্য কখনও পাতলা চাপাতি রুটি তৈরী হত না। শশা ও তরমুজ খেজুরের সাথে মিশিয়ে খেতেন। মধু এবং মিষ্টি জাতীয় জিনিস স্বভাবত পছন্দ করতেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সাঃ) দুনিয়অ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন এমতাবস্থায় যে তিনিও তার পরিবারবর্গ কেউই পেট ভরে যবের রুটি আহার করেননি। তার পরিবার পরিজনের একাধারে দুই দুই মাস ঠিক এমনভাবে কেটে যেত যে, চুলায় আগুন জ্বালানো পর্যন্ত ব্যবস্থা হত না; বরং শুধু খুরমা আর পানি খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। তিনি নিজের কাপড় নিজেই পট্টি লাগাতেন এবং নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন। রোগীর সেবা করতেন। নিজের পরিবারের সকল কাজে সহযোগিতা করতেন। রোগীর সেবা করতেন। যখনই কেহ তাকে দাওয়াত করত সে ধনী কি গরীব তার

পার্শ্বটিকা ঃ (১) এ সকল বর্ণনা সীরাতে মোগলতাঈ এর তরজমা। ইহার বিশদ বর্ণনা আমি আমার আদাবুন নবী গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

তারতম্য না করে তার বাড়িতে চলে যেতেন। কোন গরীবকে তার গরীবির জন্য হে মনে করতেন না। এবং কোন বড় ধরনের বাদশাকে তার বাদশাহীর কারণে ভয় করতেন না। সওয়ারীর পিছে নিজের গোলামকে বসিয়ে নিতেন। মোটা কাপড় পরিধান করতেন এবং সেলাই করা জুতা পায়ে দিতেন। সাদা রংয়ের কাপড় সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। বেশী বেশী সময় আল্লাহর যিকরে থাকতেন এবং বাহুল্য কথা পরিহার করে চলতেন।

নামায লম্বা ও খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন। গোলাম আর গরীবদের সাথে চলাফেরা করা থেকে বিরত থাকতেন না। সুগন্ধকে পছন্দ ও দুর্গন্ধকে ঘৃণা করতেন। বিজ্ঞজনের যথাযথ সম্মান করতেন এবং কারো সাথে রুক্ষস্বরে কথা বলতেন না। কাকেও মুবাহ খেলা ধূলা করতে দেখলে নিষেধ করতেন না। কোন কোন সময় হাস্যকর ও মনোরঞ্জনকর কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু সে সময়ও বাস্তবের পরিপন্থি কিছু বলতেন না। সকল মানুষ থেকে বেশি হাস্যমুখ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী তিনি ছিলেন। অপারগের অপারগতা তিনি সহজেই মেনে নিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, তামাম কুরআন শরীফই তণার চরিত্র ছিল। অর্থাৎ কুরআন শরীফ যা অপছন্দ করত তিনি তা অপছন্দ করতেন আর কুরআন শরীফ যা পছন্দ করত তিনি তা পছন্দ করতেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, মহানবী (সাঃ) এর ঘ্রাণ থেকে আর কোন উত্তম ঘ্রাণ আমি শুকিনি।

মহানবী (সাঃ) এর অলৌকিকতাসমূহ

পৃথিবীর রাজন্যবর্গগণ কাকেও নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠান, তখন তার সঙ্গে এমন কিছু নিদর্শন দিয়েদেন যা দেখে জনগণ তার শাসক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারে। যেমন ঃ কিছু দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত ও এমন কিছু ক্ষমতা যা সাধারণ মানুষ কার্যকর করতে পারে না। এমনভাবে যখন আল্লাহর রাসূল পৃথিবীতে আগমণ করেন, এখন তার সাথে সততা, দ্বীন-দারী ও চরিত্র মাধুর্য এবং পরিপূর্ণ মানবীয় গুণাবলী ও নিদর্শনের সাথে সাথে একটি অলৌকিক শক্তি ও সঙ্গে থাকে। যা দ্বারা বিরুদ্ধ বাদীদের মস্তক ঝুঁকে যায়। এই সকল অলৌকিক শক্তি ও প্রকৃতির নিয়মের উর্ধ্বে ক্ষমতা সমূহকে মো'জেযা বলা হয়।

আমাদের মহানবী (সাঃ) এর মো'জেযা সমূহের সংখ্যা বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও সকল নবীগণ থেকে উত্তম ও বেশী ছিল। পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেযাসমূহ তাদের জীবনকাল পর্যন্তই সীমিত ছিল। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর মো'জেযা "পবিত্র কুরআন শরীফ" আজও প্রত্যেক মুসলমানের হাতে রয়েছে।

যার মোকাবেলা করতে দুনিয়ার সকল শক্তি এমন কি জ্বিন ও ইনসান পর্যন্ত আপারগ হয়েছে। তা ছাড়া চন্দ্রকে দু'টুকরা করা, আঙ্গুলী থেকে পানি জারী হওয়া, কংকর সমূহের তাসবীহ পড়া, কাঠের খুঁটির ক্রন্দন করা, বৃক্ষের মহানবী (সাঃ) কে সালাম করা। বৃক্ষদের আহ্বান করা এবং তাদের চলে আসা, হাজার হাজার ভবিষৎবাণী সূর্যের মত সত্য হয়ে প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি হাজারো মোজেযা সমুহ যা শুধু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস সমূহের দ্বারাই প্রমাণিত। এই গুলিকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামাগণ বিশেষ করে আল্লামা সুয়ূতী "খাসায়েসের কুবরা" এবং পরবর্তী ওলামাগণ মধ্যে "আল কালামুল মুবীন" (উর্দু) এই বিষয়বস্তুর উপরই লেখা হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এর বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয় বিধায় এ পর্যন্তই পরিসমাপ্ত করছি।

ولحمدلله رب العالمين

مولای صل وسلم دائما ابدا

على حبيبك خير الخلق كلهم

অর্থঃ হে আল্লাহ! যিনি আপনার হাবীব ও সৃষ্টির সেরা তার উপর আপনি অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুণ।

পরিশেষে মহানবী (সাঃ) নসিহত মূলক পবিত্র বাণী লিপিবদ্ধ করা উপযোগ্য মনে হল এবং সেগুলোকে "জাওয়ামিউল কালিম" স্বতন্ত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযুক্ত করা হল।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين-

বান্দাহ্-মুহাম্মদ শফী' দেওবন্দী

১৭ রজবুল্ মারজাব, ১৩৪৩ হিজরী।

“জাওয়ামিউল কালিম”

চল্লিশ হাদীস

(১) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, দ্বীন সম্পর্কীয় চল্লিশটি হাদীস যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপকারের জন্যে শুনাবে এবং হেফয(২) করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আলেম ও শহীদগণের সাথে উঠাবেন এবং বলবেন, যে দরজা দিয়ে খুশি সে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর”। এই সুমহান সোয়াবের জন্যে লক্ষাধিক ওলামায়ে কেরাম নিজেদের পদ্ধতি অনুযায়ী চেহেল হাদীস লিখেছেন, যা আপামর জনসাধারণের জন্য খুবই উপকারী ও মাকবুল হয়েছে।

আমার যোগ্যতা ও মনোবলের দিক দিয়ে এ কাজে হাত দেওয়াটা একটি অতিরিক্ত কাজ বৈ কিছুই ছিলনা। কিন্তু এই অধম কর্তৃক মহা মানব (সাঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য” সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়া। যখন প্রাথমিক ছেলে মেয়েদের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে রচনা করা হল, তখন সমীচীন মনে হল যে, অত্র পুস্তকের শেষে হাদীসের মুখতাছার বাক্য গুলি যদি তুলে দেওয়া যায় যেন প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা তা সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে আমার খেয়াল হল যে, পরিপূর্ণ চল্লিশ হাদীস সংকলণ করাই উচিত। যেহেতু কণ্ঠস্থকারীগণও যেন চল্লিশ হাদীসের সুমহান ছওয়াবের অধিকারী হতে পারেন। এবং সম্ভবতঃ তাদের বরকতে এই গুনাহগারও ঐ বুযুর্গগণের খাদেমের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

(وماذلك على الله بعزيز)

জ্ঞাতব্য বিষয়

১। এ সকল হাদীসে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস। ২। যেহেতু আজকাল সাধারণভাবে মুসলমানদের চারিত্রিক অবস্থা অত্যন্ত ধ্বংশের দিকে চলেছে। আর বাল্যকালে চরিত্র গঠনের শিক্ষা খুবই প্রভাব বিস্তার করে, এ জন্যই এ পর্যায়ের হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা উন্নত চরিত্র এবং সামাজিক জীবন যাপন ও সভ্যতার মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত।

পার্শ্বটিকা ঃ روى عباس وابن البخارى سعيد كذا فى الجامع الصغير-

হাদীস হেফজ করার দুইটি রাস্তা রয়েছে। (১) মুখস্ত করে মানুষের কাছে পৌছে দেয়া (২) অথবা লিপিবদ্ধ করে প্রচার করা। এজন্যই হাদীসের ওয়াদার মধ্যে ঐ সকল লোকগণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যারা চেহেল হাদীস চাপাইয়া প্রচার করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে চেহেল হাদীসের প্রত্যেকটি কপি প্রচার করলে সুমহান ছওয়াব হবে। যদি কেউ বঞ্চিত হয় তাহলে ইহা তারই দুর্ভাগ্য। সিরাজম মুনীরা শরহে জামে ছগীর এর মধ্যে এই বিষয়টি নিম্ন বর্ণিত এবারতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

..فلو حفظ فى كتاب ثم نقل الى الناس دخل فى وعد الحديث ولو كتبها عشرين كتابا